শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়ত ঃ

শ্রীউপদেশামৃত

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্যসহ ইংরেজি

The Nectar of Instruction গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমদ্ সুভগ স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম,

SRI UPADESAMRITA (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯, ১০,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯, ১৫,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯, ২০,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯, ২০,০০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯, ১০,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯, ১০,০০০ কপি
সপ্তম সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯, ১০,০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সূচিপত্র

ভূমিকা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনটি পরিচালিত হচ্ছে শ্রীল রূপ গোস্বামীর দিব্য তত্ত্বাবধানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী, অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবেরা অধিকাংশই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী, আর তাঁরই সাক্ষাৎ শিষ্য হলেন বৃন্দাবনধামের ষড়্‌-গোস্বামীরা। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন–

রূপ-রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি ॥

"যখন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রমুখ ষড়্‌-গোস্বামীদের শাস্ত্রসম্ভার আমি হৃদয়ঙ্গম করতে আগ্রহী হব, তখনই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দিব্য প্রেমলীলার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।" শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মানব সমাজে প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। গোপীদের সাথে মাধুর্যরসের লীলা-বিলাসের মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কার্যকলাপের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল। গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবমূর্তি নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকটিত হন। সুতরাং, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে হলে এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গেলে, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট এবং শ্রীরঘুনাথ দাস–এই ষড়্‌-গোস্বামীর পদাঙ্ক বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করতে হবে।

শ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন সকল গোস্বামীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, এবং আমাদের কার্যকলাপে পথনির্দেশের উদ্দেশ্যে এই উপদেশামৃত গ্রন্থখানি অনুসরণ করার জন্য তিনি আমাদের প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন শিক্ষাষ্টক নামে তাঁর রচিত আটটি শ্লোক আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, তেমনি শ্রীরূপ গোস্বামী আমাদের প্রদান করেছেন উপদেশামৃত যাতে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারি।

সর্বপ্রকার পারমার্থিক কার্যকলাপে, মানুষের প্রথম কর্তব্য হল তার মন এবং ইন্দ্রিয়াদির সংযম। মন এবং ইন্দ্রিয়াদির সংযম না করলে, পারমার্থিক জীবনে কেউ অগ্রসর হতে পারে না। এই জড় জগতের মধ্যে প্রত্যেকেই রজো ও তমোগুণে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দেশনুসারে অবশ্যই মানুষকে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে হবে, এবং কিভাবে আরও উন্নতি করা যায়, তা সবই তখন উদঘাটিত হতে থাকবে।

কৃষ্ণভাবনায় অনুগামীর মনোবৃত্তির ওপরেই নির্ভর করে তার প্রগতি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুগামীকে অবশ্যই শুদ্ধ গোস্বামী হয়ে উঠতে হয়। বৈষ্ণবদের সাধারণত গোস্বামী বা গোসাঁই বলা হয়ে থাকে। শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রত্যেকটি মন্দিরের অধ্যক্ষের এইটাই হল পদ-পরিচয়। কেউ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হতে চাইলে, তাকে গোস্বামী হতেই হবে। গো মানে 'ইন্দ্রিয়সমূহ', এবং স্বামী মানে 'প্রভু'। নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনকে সংযত করতে না পারলে, কেউ গোসাঁই হতে পারে না। গোস্বামী হয়ে এবং তারপরে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হয়ে জীবনে চরম সার্থকতা অর্জন করতে হলে শ্রী রূপ গোস্বামী প্রদত্ত শ্রীউপদেশামৃত নামে নির্দেশাবলী অনুসরণে উদ্যোগী হতেই হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী আরও অন্য অনেক গ্রন্থাদি প্রদান করে গিয়েছেন–যেমন, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধ-মাধব, এবং ললিত-মাধব, তবে শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থখানির মধ্যেই নিহিত রয়েছে কনিষ্ঠ নবীন ভক্তমণ্ডলীর জন্য প্রথম নির্দেশাবলী। অতি কঠোরভাবে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করে চলা উচিত। তা হলে সহজেই জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। হরেকৃষ্ণ।

— অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী

শ্লোক ১

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

শব্দার্থ

বাচঃ—বাক্যের; **বেগম**—বেগ; **মনসঃ**—মনের; **ক্রোধ**—ক্রোধের; **বেগম্**—বেগ; **জিহ্বা**—জিহ্বার; **বেগম্**—বেগ; **উদর-উপস্থ**—উদর এবং জননেন্দ্রিয়; **বেগম্**—বেগ; **এতান্**—এই সব; **বেগান্**—বেগসমূহ; **যঃ**—যেই; **বিষহেত**—ধারণ করতে সমর্থ; **ধীরঃ**—শান্ত; **সর্বাম্**—সব; **অপি**—নিশ্চিত; **ইমাম্**—এই; **পৃথিবীম্**—পৃথিবী; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **শিষ্যাৎ**—শিষ্য করতে পারেন।

অনুবাদ

যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ—এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে কতকগুলি প্রশ্নের উপস্থাপনা করেন। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে তাঁর বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, তাঁর একটি প্রশ্ন ছিল, "যদি মানুষ ইন্দ্রিয় সংযম করতে না পারে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করে কেন?"—চোর ভালভাবেই জানে, চুরি করার সময় সে ধরা পড়তে পারে, এমন কি অন্য চোরদের ধরা পড়ে শাস্তি পেতে দেখেও সে চুরি করে। দর্শন এবং শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কিছু দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর উচ্চ-বুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষ কিছু শুনে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যখন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আইনের বই পড়ে জানতে পারে, চুরি করা ভাল নয়, কারণ ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হয়, তখন সে চুরি করা থেকে বিরত থাকে। আর যার বুদ্ধি অল্প, সে চুরি করে ধরা পড়ে, কিন্তু একবার শাস্তি পাবার পর সে আর চুরি করে না। কিন্তু যে বাস্তবিক মূর্খ, সে দেখে শুনে এমন কি শাস্তি পেয়েও আবার চুরি করে। এমন কি সেই মূর্খ লোকটি যদি প্রায়শ্চিত্ত করে অর্থাৎ সরকারের কাছে শাস্তিও পায়, তবু কয়েদখানা থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার চুরি করা আরম্ভ করে। কয়েদখানার শাস্তিকে প্রায়শ্চিত্ত মনে করলে সেই রকম প্রায়শ্চিত্তের কী মূল্য? তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ এখানে বলেছেন—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোহহিতম্ ।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥
ক্বচিন্নিবর্ততেহভদ্রাৎক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ ।
প্রায়শ্চিত্তমথোহপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥

তিনি এই ধরনের প্রায়শ্চিত্তকে হাতির স্নানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাতি নদীতে সুন্দর স্নান করে, কিন্তু স্নান শেষে তীরে উঠেই সে সমস্ত দেহে ধুলো ছড়িয়ে দেয়। তা হলে এই ধরনের স্নানের কি প্রয়োজন? সেই রকম অনেক পরমার্থী আছেন, যাঁরা 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং সেই সঙ্গে নানা প্রকার অপরাধও করে চলেন। তাঁরা ভাবেন 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে তাঁরা সব রকম অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। কিন্তু তা অত সহজে সাধিত হয় না, কেননা মহামন্ত্র কীর্তনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ দশ রকমের নামাপরাধের মধ্যে এই অপরাধকে বলা হয়—

নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ ॥

অর্থাৎ নামবলে পাপাচরণ করা। ঠিক সেই রকম অনেক খ্রিস্টান আছেন,

যাঁরা সপ্তাহের শেষে গির্জায় গিয়ে প্রবীণ পুরোহিতের সামনে তাঁদের পাপকর্মের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা মনে করেন, এইভাবে তাঁরা পাপমুক্ত হতে পারেন এবং যখনই শনিবার শেষে রবিবার আসে, তখন থেকে পুনরায় পাপকার্য শুরু করেন এবং মনে করেন যে, সপ্তাহের শেষে শনিবার দিন গির্জায় গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেই সমস্ত পাপকর্ম মোচন হয়ে যাবে।

কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তত্ত্বদর্শী, তাই তিনি এই ধরনের প্রায়শ্চিত্তের নিরর্থকতা উপলব্ধি করে নিন্দা করেছেন। তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও এর নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাপকর্ম কখনও পুণ্য কর্মের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না।

তাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে আমাদের অন্তরের সুপ্ত কৃষ্ণভাবনামৃতকে জাগরিত করা। যথার্থ প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে যথার্থ জ্ঞানের একটা সম্বন্ধ আছে, আর সেই জন্য নির্দিষ্ট উপায়ও আছে। নিয়মিত স্বাস্থ্যকর উপায় অবলম্বন করলে যেমন কেউ সাধারণত রোগাক্রান্ত হয় না, তেমনি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রতিটি মানুষকেই কতকগুলি নিয়মের মাধ্যমে জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। সেই রকম বিধিবদ্ধ জীবনকেই 'তপস্যা' বলে।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করে, নিজস্ব সব কিছু শ্রীগুরুদেবের চরণে অর্পণ করে, সত্যনিষ্ঠ এবং শুদ্ধাচারী হয়ে যোগাসন অভ্যাস করে ক্রমশ পরমতত্ত্ব-জ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে এবং তাঁর নির্দেশানুসারে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করার ফলে অষ্টাঙ্গ যোগের মনঃসংযোগ ক্রিয়াদি অতি সহজেই অতিক্রম করেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের সাধারণ ও প্রাথমিক বিধি-অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, মাদক-দ্রব্য গ্রহণ, জুয়া খেলা ইত্যাদি বর্জন করে সদগুরুর নির্দেশে ভগবৎ-সেবা করার মাধ্যমে তাঁরা অনায়াসেই সংযম করতে পারেন। এই সহজ সরল পন্থাটি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ কর্তৃক স্বীকৃত।

সর্ব প্রথমে বাক-সংযমের প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের বাক শক্তি আছে, তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমরা কথা বলতে শুরু করি। কৃষ্ণকথা না বলে আমরা অন্য সব বাজে কথা বলি। মাঠের ব্যাঙ যেমন বিরক্তিকর আওয়াজ করে চলে, সেই রকম আমাদের জিভ থাকার জন্য আমরাও কথা বলে চলি। কিন্তু যা বলি তা সবই বাজে কথা। ব্যাঙের বিরক্তিকর আওয়াজ শুধু তার মৃত্যুরূপী সাপকে ডেকে আনে। যদিও এই আওয়াজ তার মৃত্যুকে ডেকে আনে, তবুও ব্যাঙ সেই আওয়াজ করেই চলে।

বিষয়ী এবং নির্বিশেষবাদী, মায়াবাদী দার্শনিকদের এই রকম ব্যাঙের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তারা সব সময় অযথা কথা বলে এবং এইভাবে তাদের মৃত্যুকে ডেকে আনে। তবে বাক্-সংযম অর্থে স্বতঃপ্রণোদিত মৌন অবলম্বন নয়, যা মায়াবাদী দার্শনিকেরা করে থাকেন। মৌনতা কিছুকালের জন্য সহায়ক হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কাজে লাগে না। বাক্ সংযমের কথা শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—কৃষ্ণকথা প্রচারের মাধ্যমে, আমাদের বাক্শক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনে নিয়োগ করে আমরা বাক্-সংযম করতে পারি। ভগবদ্ভক্ত বা কৃষ্ণকথার প্রচারক কখনও মৃত্যুর কবলে আবদ্ধ হন না। বাক্সংযমের গুরুত্ব এইখানেই।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন অর্পণ করতে পারলেই মনোবেগ বা চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার ॥

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো তার মায়া হচ্ছে অন্ধকারের মতো। যেখানে সূর্যের আলো আছে, সেখানে অন্ধকার থাকে না। সেই রকম কৃষ্ণভাবনায় মন তন্ময় হলে, মায়ার দ্বারা আর তা প্রভাবিত হতে পারে না। যোগমার্গের 'নেতি

নেতি' উপায়ে এই কাজ হবে না। মনকে ভাবনাশূন্য করা একটা কৃত্রিম পন্থা। মন ভাবনাহীন থাকতে পারে না। তবে কৃষ্ণচিন্তা করে, কৃষ্ণসেবার কথা চিন্তা করে মনকে সংযত করা যায়।

ঠিক সেইভাবে ক্রোধকে আমরা একেবারে জয় করতে পারি না, কিন্তু ভগবদ্‌বিদ্বেষীদের প্রতি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেব দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাই-এর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। কারণ ঐ ভ্রাতৃদ্বয় নিত্যানন্দ প্রভুকে অপমান করে ও তাঁকে গুরুতরভাবে আঘাত করে। শিক্ষাষ্টকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা–অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা দীন এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হতে হবে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করলেন কেন? এর অর্থ হচ্ছে নিজের ক্ষেত্রে ভক্ত সব অপমান সহ্য করবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের অবমাননায় যথার্থ ভক্ত আগুনের মতো ক্রোধ প্রকাশ করবেন।

ক্রোধবেগ সংযত করা যায় না। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায়। ক্রোধের বলেই পবন-পুত্র হনুমান লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দেন। এইভাবে তিনি আজও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হিসাবে জগৎপূজ্য। এইভাবে হনুমান তাঁর ক্রোধের যথাযোগ্য ব্যবহার করেন।

অর্জুনও তাই করেছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করেননি, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যুদ্ধ তোমায় করতেই হবে।" ক্রোধ ছাড়া যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাই ক্রোধবেগ জয় করা সম্ভব একমাত্র কৃষ্ণসেবায় তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে।

আমরা সবাই জিহ্বাবেগ অনুভব করি। জিহ্বা সব সময় মুখরোচক খাবার খাওয়ার জন্য উৎসুক। সাধারণত জিহ্বার আসক্তি অনুযায়ী আমাদের খাবার খাওয়া উচিত নয়, বরং জিহ্বা দিয়ে প্রসাদ খেয়ে জিহ্বাবেগ সংযত করা উচিত। শুধুমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করাই ভক্তের একমাত্র কর্তব্য। নিয়মিত সময়ে

প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। জিহ্বা বা উদরের তাড়নায় দোকানে তৈরি কোন খাবার বা মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়। যদি আমরা সংকল্প করে শুধু কৃষ্ণ-প্রসাদই গ্রহণ করি এবং তা পালন করে চলি, তা হলে আমরা উদরবেগ ও জিহ্বাবেগ জয় করতে পারি।

সেই রকম অপ্রয়োজনে যৌন সঙ্গম না করে উপস্থবেগ জয় করা যেতে পারে। উপস্থ শুধু কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যথায় তার ব্যবহার করা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে বিবাহের ব্যবস্থা আছে, তবে তা ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য নয়–কৃষ্ণভক্ত সৃষ্টি করার জন্য। সন্তানেরা একটু বড় হলেই তাদের ডালাস, টেক্সাস-এ গুরুকুলে পাঠান হয়, সেখানে শিক্ষা দিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় করে তোলা হয়। যেহেতু জগতে অনেক কৃষ্ণভক্তের প্রয়োজন, তাই যারা সন্তানদের কৃষ্ণভক্ত করে তুলতে পারবে, তাদেরই বিবাহ করা উচিত।

কৃষ্ণভাবনাময় সংযম অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে দক্ষ হলে তবেই মানুষ প্রকৃত সদ্‌গুরু হতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 'উপদেশামৃত' গ্রন্থের 'অনুবৃত্তি' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, দেহাত্ম-বুদ্ধির জন্য আমাদের মধ্যে তিন প্রকার বেগের উদ্ভব হয়–তা হচ্ছে বাক্যের বেগ, মনের বেগ এবং দৈহিক বেগ। এই তিন বেগ জীবাত্মার জীবন অপবিত্র করে তোলে। আর এই সব বেগ-সংযমকারীকে তপস্বী বলা হয়। এইভাবে তপস্যা বলে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার কবল হতে মুক্তি লাভ করা যায়।

কৃষ্ণবিহীন বাজে কথা বলার যে আগ্রহ, তাকেই বলা হয় বাক্যের বেগ, যা নির্বিশেষবাদী, মায়াবাদী দার্শনিকগণ বা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে তথা কর্মকাণ্ডে রত জড়জাগতিক মানুষেরা করে থাকে। বাক্যবেগ বলতে কৃষ্ণবিহীন কথা, জ্ঞানী-নির্বিশেষবাদীদের কথা বা কর্মীদের কথা বোঝায়– ইন্দ্রিয় তর্পণ করাই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জড় বিষয় নিয়ে আলোচনা বা সাহিত্য রচনাও

বাক্য বেগের অন্তর্গত। কত লোক কত বই লিখেছেন, লিখে লিখে বই-এর পাহাড় করেছেন, অথচ এই সবই অর্থহীন। কারণ তাতে ভগবানের কথা লেখা নেই, শ্রীকৃষ্ণের কথা লেখা নেই। এই সবই বাচোবেগের লক্ষণ। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণকথা। তাই এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥

"শ্রীভগবানের গুণকীর্তনই জগৎকে পবিত্র করতে পারে। যেখানে সেই ভগবৎ-কীর্তন নেই, সেই স্থান সাধু কৃষ্ণভক্তের জন্য নয়, তা শুধু কাকের তীর্থস্বরূপ।"

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥

"পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, যশ, রূপ, লীলা সমন্বিত গ্রন্থাদি দিব্য এবং উচ্ছৃঙ্খল মানব-সমাজে বিপ্লব নিয়ে আসে। ঐ সমস্ত দিব্য সাহিত্য অসম্পূর্ণভাবে রচিত হলেও শুদ্ধ সাধু সজ্জনেরা তা শ্রবণ, কীর্তন ও গ্রহণ করে থাকেন।"

উপরের শ্লোকটি পড়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎ-কথা বলার মাধ্যমে আমরা বাজে গ্রাম্যকথা বলা বন্ধ করতে পারি। আমাদের প্রতিটি কথা কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

আমাদের চঞ্চল মনের উত্তেজনাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। তার একটিকে বলা হয় 'অবিরোধ প্রীতি' আর অন্যটিকে বলা হয় 'বিরোধযুক্ত ক্রোধ'। মায়াবাদ দর্শনের প্রতি অনুরাগ, কর্মবাদীদের সকাম কর্মে বিশ্বাস,

জাগতিক কামনা-বাসনা ভিত্তিক পরিকল্পনা, এগুলিকে বলা হয় 'অবিরোধ প্রীতি'। জ্ঞানী, কর্মী ও জড়বাদী বিষয়ী ব্যক্তিরা নানা রকম পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষকে নানা রকম প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের পরিকল্পনাগুলি যখন ব্যর্থ হয় এবং তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না, তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়। জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বিপর্যস্ত হলে ক্রোধ সৃষ্টি হয়।

সেই রকম দেহবেগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই তিনটি ইন্দ্রিয় দেহে এক সরল রেখায় অবস্থিত আর দৈহিক বেগ বা দৈহিক তাড়নার শুরু হচ্ছে এই জিহ্বা থেকে। তাই যদি জিহ্বার কাজ শুধু মাত্র কৃষ্ণ-প্রসাদ সেবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়, তা হলে এইভাবে জিহ্বাবেগ সংযত করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই উদর ও উপস্থবেগ জয় করা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

রস বা স্বাদ ছয় রকমের। কেউ যদি তাদের একটির দ্বারা উত্তেজিত হয়, তা হলে সে জিহ্বাবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। মানুষ মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আহারে আসক্ত। এই সমস্ত খাদ্য রক্ত ও বীর্যের দ্বারা গঠিত এবং তা মৃত দেহরূপে আহার করা হয় এবং এদের যে কোন একটি রসের দ্বারা লালায়িত হলে মানুষ জিহ্বাবেগের দ্বারা তাড়িত হয়।

আবার অনেকেই শাক-সবজি, দুধ থেকে তৈরি খাবারের প্রতি আসক্ত। এইগুলি সবই জিহ্বার তৃপ্তির জন্য। কিন্তু যারা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে চান, তাঁদের এইভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য খাবারে অতিরিক্ত মশলা, লঙ্কা বা তেঁতুল খাওয়া ত্যাগ করতে হবে। পান, সুপারী, হরিতকী, চা, কফি, তামাক, মদ, আফিং, গাঁজা ইত্যাদিতে আসক্তি বা এর দ্বারা নেশা করার মাধ্যমে অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা হয়। তাই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে হলে, এই সমস্ত নেশা ত্যাগ করতে হয়। যদি শুধু কৃষ্ণপ্রসাদই খাবার হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তা হলে মায়ার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শাক-সবজি, শস্য, ফল, মূল, দুধ, জল দিয়ে যে খাবার তৈরি হয় ভগবান নিজে সেই সব আহার্য হিসাবে অনুমোদন করেন। শুধু সুস্বাদুতার জন্য কেউ যদি অতিরিক্ত প্রসাদ খায় তবে তাও ইন্দ্রিয় তর্পণ বলে বিবেচিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত মুখরোচক প্রসাদ গ্রহণেও বিরত হতে বলেছেন। আবার ভগবানকে নিবেদন করার অছিলায় নিজ ইন্দ্রিয় রসনা তৃপ্তির জন্য যদি অতি সুস্বাদু ভোগান্ন তৈরি করা হয়, তবে তাও জিহ্বাবেগ তাড়নার কারণ বলে গণ্য হয়। ধনী গৃহে ভাল ভাল খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও জিহ্বার তৃপ্তি বলে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লেখা আছে–

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

অর্থাৎ "জিহ্বার তৃপ্তি সাধনের জন্য যে সর্বদা তৎপর এবং উদরবেগ ও যৌন তাড়নায় যে সব সময় চঞ্চল, তার পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব নয়।"

আগেই বলা হয়েছে যে জিহ্বা, উদর ও উপস্থ একই সরলরেখায় অবস্থিত এবং একই শ্রেণীভুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।' (চৈ. চ. অন্ত্য. ৬/২৩৬) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার লালসা আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই

একাদশী, জন্মাষ্টমী ও অন্যান্য বৈষ্ণব-তিথিগুলিতে উপবাস করে আমরা উদরবেগ সংযত করতে পারি।

উপস্থবেগ সম্বন্ধে বলা যায় যৌনসঙ্গম দুই রকম–একটি বৈধ এবং অপরটি অবৈধ। উপযুক্ত বা যোগ্য ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করতে পারে ও সুসন্তান লাভের জন্য যৌনসঙ্গম করতে পারে। তা যেমন আইনানুগ, তেমনই শাস্ত্রসম্মত। অন্যথায় যৌন-তৃপ্তির জন্য মানুষ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করবে, অসংযতভাবে যৌন উপভোগ করবে। কৃত্রিম উপায়ে যৌন সঙ্গম, অস্বাভাবিকভাবে যৌন সঙ্গম, যৌনকথা আলোচনা, যৌন চিন্তা বা স্ত্রীসঙ্গ কামনা ইত্যাদিকে শাস্ত্রে অবৈধ যৌন জীবন বলা হয়। এইভাবে যৌন জীবন যাপন করার ফলে মানুষ মায়াবদ্ধ হয়। এই উপদেশগুলি শুধু গৃহস্থদের জন্যই নয়, যারা ত্যাগী, যারা সন্ন্যাসী, তাদের ক্ষেত্রেও এইগুলি প্রযোজ্য।

'প্রেমবিবর্ত' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলেছেন–

বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে–
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধা-কৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে ॥

তা হলে আমরা এই শিক্ষা পাচ্ছি, যে ব্যক্তি ছয় বেগ অর্থাৎ বাচোবেগ, মনোবেগ, ক্রোধোবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ জয় করেছে, তাকেই 'স্বামী' বা 'গোস্বামী' বলা হয়। 'স্বামী' মানে কর্তা বা নিয়ন্তা আর গোস্বামী মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা কর্তা। কারণ 'গো' শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়। কেউ যখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে স্বামী নামে

অভিহিত করা হয়। তখন তিনি কোন পরিবার সম্প্রদায় বা সমাজের কর্তা বা নিয়ন্তা নন, তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা কর্তা। যিনি সংযম করতে পারেন না, তিনি গোস্বামী নন; তাঁকে 'গোদাস' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাস বলা হয়। বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বামী বা গোস্বামীদের সর্বতোভাবে দিব্য ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে গোদাসরা সব সময়েই ইন্দ্রিয় তর্পণে রত, বিষয় ভোগে রত। তাদের অন্য কোন কাজ নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ গোদাসদের 'অদান্ত-গো' বলে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয় সংযত নয়। তারা কখনও ভক্তি লাভ করতে পারে না, কৃষ্ণদাস হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/৩৯) প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন–

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥

"ইন্দ্রিয়-তর্পণই যাদের জীবনের লক্ষ্য, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা অন্যের সাহায্য বা সম্মিলিত সহায়তায় কোনভাবেই, তাদের পক্ষে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া সম্ভব নয়। অসংযত ইন্দ্রিয়ের তাড়না তাদের মায়ার অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে, আর প্রমত্ত হয়ে তারা বারবার চর্বিত দ্রব্যই চর্বণ করে চলবে।"

শ্লোক ২

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥

শব্দার্থ

অত্যাহারঃ—অধিক আহার বা সঞ্চয়; **প্রয়াসঃ**—অধিক প্রচেষ্টা; **চ**—এবং; **প্রজল্পঃ**—অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা; **নিয়ম**—নিয়মনীতি; **আগ্রহঃ**—আগ্রহ; **জন-সঙ্গঃ**—জড়জাগতিক বিষয়ী কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ; **চ**—এবং; **লৌল্যম**—গ্রহণ চাঞ্চল্য বা লোভ; **চ**—এবং; **ষড়্‌ভিঃ**—এই ছয়টি দোষ দ্বারা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **বিনশ্যতি**—বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ বা প্রয়োজনাধিক অর্থ সঞ্চয়, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা, কৃষ্ণ-বিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য কথন, পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম-নীতিগুলি অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুশীলন করার প্রচেষ্টা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছানুসারে কার্য-সম্পাদন করার প্রচেষ্টা, কৃষ্ণভাবনাবিমুখ জড়বিষয়ী লোকের সঙ্গ করা, পার্থিব বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া–কোন ব্যক্তি যখন উপরোক্ত ছয়টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

মানব-জীবন সরলতাপূর্ণ ও ভগবদ্ভাবনাময় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বদ্ধজীব মাত্রই মায়ার অধীন। এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্ট হয়েছে সকলকে কর্মরত রাখার জন্য। শ্রীভগবানের তিনটি শক্তি। প্রথমটির নাম অন্তরঙ্গা শক্তি, দ্বিতীয়টির নাম তটস্থা শক্তি ও তৃতীয়টির নাম বহিরঙ্গা শক্তি। জীবশক্তি তটস্থা শক্তির অন্তর্গত। কারণ

জীবশক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্তী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ নিত্য দাস হওয়ায় জীবাত্মা কখনও অন্তরঙ্গা শক্তির, কখনও আবার বহিরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। যখন জীবাত্মা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে থাকে, তখন সে তার স্বাভাবিক নিত্যস্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে। তখন ভগবৎ সেবায় তাকে সতত নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১৩) তার উল্লেখ আছে–

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মহাত্মাগণ মোহমুক্ত হয়ে আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকে। আমাকে অব্যয়, আদি পুরুষ, সর্বশক্তিমান ভগবান জেনে তারা সতত আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে।"

সব রকম সংকীর্ণতামুক্ত উদার হৃদয় ব্যক্তিগণই মহাত্মা। যারা কৃপণ, তারাই সংকীর্ণচিত্ত। তারা সব সময় ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত। কখনও কখনও তারা জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদ ইত্যাদি বাদের নামে মানব কল্যাণে তাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করে। তারা হয়ত জাতির বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা সমাজের ভোগের জন্য ব্যক্তিগত ভোগবাঞ্ছা ত্যাগ করে। এই সব কাজও বৃহৎ ভোগবাসনা, যদিও ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক ভোগ-বাসনা। জাগতিক দৃষ্টিতে এই সব মানব-কল্যাণকর হলেও এই সব কাজের কোন পারমার্থিক মূল্য নেই। কারণ এই সব কাজের মূলেই রয়েছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। তা হয় ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তোষণ বা বৃহত্তর সমাজের ইন্দ্রিয়-তোষণ; কিন্তু যিনি পরমেশ্বর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা করেন, তিনিই মহাত্মা বা উদার হৃদয় ব্যক্তি।

উল্লিখিত ভগবদ্গীতার শ্লোকে 'দৈবীং প্রকৃতিম্' অর্থে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। এই শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী বা তাঁর শক্তিতত্ত্ব লক্ষ্মীদেবীরূপে প্রকটিত হয়েছেন। যখন জীবাত্মা অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়াধীন হয়, তখন তার কাজ শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সেবা করা ও তাঁদের তুষ্ট করা। শ্রীকৃষ্ণ সেবাই হচ্ছে মহাত্মার ধর্ম বা কাজ। যে মহাত্মা নয় সে নিশ্চয়ই দুরাত্মা, সংকীর্ণচিত্ত। সেই রকম সংকীর্ণচিত্ত দুরাত্মা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার কর্তৃত্বাধীন হয়।

বস্তুত সংসারে জীব মাত্রই মহামায়ার কর্তৃত্বাধীন। আর মহামায়ার কাজই হচ্ছে জীবকে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক– এই ত্রিতাপ দুঃখে আবদ্ধ করে ক্লেশ দেওয়া। আধিদৈবিক ক্লেশ যেমন অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি; অন্যান্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত ক্লেশ আধিভৌতিক ক্লেশ; জীবপ্রদত্ত যেমন পোকামাকড়, জীবাণু শত্রুদের দেওয়া ক্লেশ হচ্ছে আধিভৌতিক ক্লেশ। আর মানসিক ও শারীরিক ক্লেশকে আধ্যাত্মিক ক্লেশ বলে। মায়াবদ্ধ জীব বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা ত্রিতাপক্লিষ্ট হয়ে নানা ক্লেশাদি ভোগ করে।

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হচ্ছে মায়া-কবলিত জীবনের প্রধান সমস্যা। সংসারে দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য কাজ করতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণানুশীলনের আনুকূল্যে কিভাবে এই সব কাজ করা সম্ভব? দেহরক্ষার জন্যই প্রত্যেকের আহার, বস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়। যদি এই স্বাভাবিক নীতি গ্রহণ করা হয়, তবে দেহরক্ষার কোন অসুবিধা হবে না।

প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় জীবনের ক্রমবিকাশে ইতর জীব প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ বা সংগ্রহ করে না, তাই পশুসমাজে সাধারণত অর্থনৈতিক সমস্যা বা প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই। যেমন, এক বস্তা চাল প্রকাশ্য স্থানে পড়ে থাকলে পাখিরা আসবে। তারা কয়েকটি করে দানা খেয়ে চলে যাবে। কিন্তু একজন মানুষ তা করবে না। সে আসবে এবং বস্তাভর্তি সমস্ত চাল নিয়ে যাবে। সেই লোকটি যথাসাধ্য উদরপূর্তি করবে আর বাকি চাল মজুত

রেখে দেবে। শাস্ত্রানুসারে এইভাবে অতিরিক্ত সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। এটাই সমগ্র বিশ্ববাসীর দুঃখের কারণ।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার বা সংগ্রহ করাকে 'প্রয়াস' বলে। ভগবৎ কৃপায় সামান্য জমি ও একটি দুগ্ধবতী গাভীর মালিক জগতে যে কোন স্থানে পরম শান্তিতে বসবাস করতে পারে। জীবিকার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ গরুর দুধ ও জমিতে চাষ করে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়, তাতে জীবিকা নির্বাহ করা যায় এবং এইভাবে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। মানুষের পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীভগবান তাকে উচ্চতর বুদ্ধি, বিবেক দিয়েছেন যাতে সে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করতে পারে ও সব শেষে অন্তিম লক্ষ্য ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এখনকার তথাকথিত সভ্য মানুষেরা ঈশ্বরলাভে যত্ন করে না, বরং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, জিহ্বার লালসা তৃপ্তির জন্য তাদের বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। শ্রীভগবান মানুষের জন্য বিশ্বময় প্রচুর খাদ্যশস্য ও দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিমান মানব-সমাজ তার উচ্চতর বিবেকবুদ্ধি ভগবৎ অনুশীলনে নিয়োগ করে না, বরং অন্যান্য অনেক অপ্রয়োজনীয়, উদ্দেশ্যহীন বিষয়ে বুদ্ধির অপব্যবহার করে। এইভাবে কারখানা, কসাইখানা, গণিকালয় ও মদের দোকানের প্রসার হচ্ছে। অতিরিক্ত আহার করা, জীবনযাত্রার জন্য অতিরিক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করা, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কৃত্রিমভাবে জীবনযাত্রার উপকরণ বৃদ্ধি করার কুফল জানালে লোকে মনে করে যে, তাদের আদিকালের সহজ-সরল জীবনযাত্রার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না। কারণ, সরল জীবন ও পারমার্থিক চিন্তার এখন কেউ সমাদর করে না।

ভগবৎ-অনুভূতি লাভের জন্যই মানুষের জীবন, তাই মানুষ উন্নত চিন্তাশক্তি লাভ করেছে। যারা এই কথা বিশ্বাস করে, তাদের উচিত, বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করা। এইভাবে আচার্যদের শিক্ষা গ্রহণ করলে জ্ঞানবান হওয়া যায় ও

জীবন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৯) শ্রীসূত গোস্বামী যথার্থ মানব ধর্মকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন–

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

"ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবকে অন্তিম মুক্তি দান করা। ধর্মানুষ্ঠান বৈষয়িক লাভের জন্য নয়। আবার যিনি পরম, ধর্ম যাজন করেন, ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য বৈষয়িক উন্নতি ব্যবহার করা তাঁর উচিত নয়।" শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্বধর্মাচরণই সভ্যতার প্রাথমিক পরিচয়। এই স্বধর্ম শিক্ষার জন্যই মানুষের বিবেকের উন্নতি সাধন করা উচিত। মানব সমাজে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিব্রু ইত্যাদি নানাবিধ ধর্মমত আছে। কারণ, ধর্মহীন মনুষ্য সমাজ পশুতুল্য।

আগেই বলা হয়েছে যে, ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে– ধর্মাচরণ হচ্ছে মুক্তি লাভের জন্য, জীবিকা অর্জনের জন্য নয়। কখনও কখনও জাগতিক উন্নতির জন্য মনগড়া অনেক ধর্মের সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু তার লক্ষ্য থেকে প্রকৃত ধর্মের লক্ষ্যের অনেক পার্থক্য। ধর্ম মানে ভগবানের আইন। আর ভগবনের আইন বুঝে তা সঠিকভাবে পালন করলে, শেষ পর্যন্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। দুর্ভাগ্য বশত, লোক জাগতিক বা ভৌতিক উন্নতির জন্য ধর্ম পালন করে। কারণ মানুষের 'অত্যাহার' অর্থাৎ জড়জাগতিক ভোগ উন্নতির বাসনা প্রবল। তবে সত্যিকারের ধর্মশিক্ষা হচ্ছে, জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণে তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণানুশীলন করা। আমরা আর্থিক উন্নতি চাইলেও সত্যিকারের ধর্ম সংসার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণই মাত্র অনুমোদন করে। *জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা*– অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম তত্ত্ব বা পরম সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। আর যদি আমরা এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রয়াস না করি, তা হলে আমাদের কৃত্রিম প্রয়োজন মেটাতেই অতিরিক্ত প্রয়াস করব। পরমার্থ শিক্ষার্থীর জড় প্রয়াস ত্যাগ করা উচিত।

আর একটি প্রতিবন্ধক হচ্ছে *প্রজল্প* অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথা। ভেক (ব্যাঙ) যেমন নিরর্থক শব্দ করে, আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র আমরাও তেমন অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে শুরু করি। যদি কথা বলতেই হয়, তবে আমাদের সব সময়ই কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্বন্ধে কথা বলা উচিত। যারা কৃষ্ণবিমুখ, তারা নানা পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি বহুবিধ অর্থহীন কাজে তাদের মানব জীবনের বহু মূল্যবান সময় ও শক্তির অপচয় করে। আবার পাশ্চাত্য দেশে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকেরা তাসখেলা, মাছধরা, টেলিভিশন দেখা ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিতর্ক করে কত সময় নষ্ট করে। অথচ এই সব কাজ অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। তাই এই সবই *প্রজল্প* এর অন্তর্গত। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহী বুদ্ধিমানেরা কখনই এই ধরনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে না।

'জনসঙ্গ' দ্বারা কৃষ্ণবিমুখ লোকদের সঙ্গকে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা কৃষ্ণবিমুখ তাদের সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাজ্য। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই একমাত্র কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করতে বলেছেন (ভক্ত সনে বাস)। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে বসবাস করে কৃষ্ণসেবা করা উচিত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে ভগবৎ সেবা করলে সাধনার উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। বিষয়ীরা তাদের কর্মক্ষেত্র প্রসার বা বিস্তারের জন্য নিজ ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সংঘ বা সংস্থা গঠন করে। যেমন জড়জাগতিক কর্মজগতে stock exchange বা শেয়ার মার্কেট এবং chamber of commerce বা বণিক সভা আছে। ঠিক সেই রকম কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গলাভের জন্য আমরা এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছি। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এই পারমার্থিক সংঘ দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে। জগতের বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তি তাদের কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরণের জন্য এই সংঘে যোগদান করছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুবৃত্তি ভাষ্যে লিখেছেন যে, জ্ঞানী বা মনোধর্মীদের জ্ঞানার্জনের অতিশয় প্রয়াসও *'অত্যাহার'* অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহরণের চেষ্টা বলে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে কৃষ্ণভাবনা বর্জিত জ্ঞানীদের শুষ্ক জ্ঞানালোচনা ও বিপুল গ্রন্থ রচনা সবই নিষ্ফল। কারণ তাতে কোনও কৃষ্ণকথা নেই। সেই রকম অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য হরিবিমুখ কর্মীরা অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেই সব রচনাই অত্যাহারের পর্যায়ভুক্ত। আবার যারা অতিমাত্রায় ভোগী, যারা শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়াসী, তাদের কৃষ্ণসেবা-বিমুখ প্রচেষ্টা সবই অত্যাহারের প্রভাবের অধীন।

কর্মী তার পুত্র-পৌত্রাদির ভোগ-সুখাদির জন্য পরিশ্রম করে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে অথচ মৃত্যুর পর তার কি গতি হবে, তা সে জানে না। ভোগ বৃদ্ধির জন্য কেবল অর্থ অর্থ করে তার জীবন অতিবাহিত হয়। নিজের পরবর্তী জীবনের কথা কখনো এই মুর্খেরা ভাবে না। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময় একজন খুব বড় কর্মী নিজের সন্তানদের ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য প্রচুর ধন সঞ্চয় করে। তারপর মৃত্যুর পর কর্ম অনুসারে সে তার বাড়ির পাশেই এক মুচির ঘরে জন্ম গ্রহণ করে। একদিন সে তার পূর্ব জন্মের পুত্র পৌত্রদের নিকট যায়, কিন্তু সেখানে সে নিজ পুত্র পৌত্রদের দ্বারা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পাদুকার দ্বারা প্রহৃত হয়। কর্মী ও জ্ঞানীরা যতদিন কৃষ্ণভাবনামুখী না হয়, ততদিন তাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টাই নিতান্ত নিষ্ফল হতে থাকে।

নিয়মাগ্রহের দ্বারা বোঝায় কিছু কিছু শাস্ত্র-বিধিকে শুধু তাৎকালিক সুবিধা লাভের জন্য গ্রহণ করা। আর পারমার্থিক উন্নতির জন্য উদ্দিষ্ট শাস্ত্র-বিধিসমূহ অবহেলা করাকেও নিয়মাগ্রহ বলে।

'আগ্রহ' শব্দের অর্থ 'গ্রহণ করার তীব্র ইচ্ছা' আর *'অগ্রহ'* মানে 'গ্রহণ করার অক্ষমতা'। *'নিয়ম'* শব্দটি এই দুটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে *'নিয়মাগ্রহ'* হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখেছি যে, *'নিয়মাগ্রহ'* শব্দটি দুটি অর্থ বহন করে। অতএব

যারা কৃষ্ণভাবনাময় হতে চান, তারা শাস্ত্র বিধি শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পালন না করে কৃষ্ণভজনের উন্নতি করার জন্য তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, জুয়াখেলা ও মাদকাদি কঠোরভাবে বর্জন করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হরিভক্তি অনুশীলন করা উচিত।

মায়াবাদীরা বৈষ্ণব নিন্দা করে। তাই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। এছাড়া জড় সুখে আগ্রহী ভুক্তিকামী, নিরাকার নির্বিশেষ পরম তত্ত্ব ব্রহ্মের সাথে সাযুজ্য লাভে আগ্রহী মুক্তিকামী ও অষ্টাঙ্গিক যোগচর্চায় আগ্রহী সিদ্ধিকামী সকলেই অত্যাহারী হওয়ায় তাদের সঙ্গও কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নয়।

যোগসিদ্ধি দ্বারা মনের সম্প্রসারণ, ব্রহ্মে লীন হওয়া বা অন্য কোন বড় যোগসিদ্ধি লাভ এই সবই লোভ, অর্থাৎ *'লৌল্য'*-এর অন্তর্গত। এই সব জড়জাগতিক লাভ বা তথাকথিত পরমার্থিক উন্নতি, কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্তরায় মাত্র।

বর্তমানে পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদীদের মধ্যে যে আধুনিক যুদ্ধাবস্থা চলছে, তা শ্রীল রূপ গোস্বামীর 'অত্যাহার' সম্বন্ধে উপদেশ উপেক্ষা করারই ফল। আজকাল পুঁজিবাদীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করছে আর সাম্যবাদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে সব ধনসম্পদ জাতীয় সম্পদে পরিণত করছে। দুর্ভাগ্য এই যে, সাম্যবাদীরাও ধন ও তার বন্টন সমস্যার সমাধান করতে জানে না। তাই পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে সাম্যবাদীদের কাছে ধনসম্পদ হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ উভয়েরই বিরোধী এই কৃষ্ণভাবনাময় মতাদর্শ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সব কিছুর মালিক। তাই যতদিন না সমস্ত সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসছে, ততদিন জগতের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনই সমাধান হতে পারে না। সাম্যবাদীই হোক আর পুঁজিবাদীই হোক, কৃষ্ণভাবনা ব্যতীত অন্য কোনভাবেই এই সমস্যার সমাধান হবে না।

ধরা যাক একশ' টাকার একটি 'নোট' রাস্তায় পড়ে আছে। হয়ত কেউ দেখে সেটা তুলে নিয়ে পকেটস্থ করল। এই ধরনের লোক নিশ্চয় সৎ নয়। অন্য একজন এসে 'নোট'টা দেখে ভাবতে পারে এটা অন্যের জিনিষ, তার স্পর্শ করা উচিত নয়; এই ভেবে সে 'নোট'টা ফেলে ফেলে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় লোকটি চুরি না করলেও কি করে নোটটার উপযুক্ত ব্যবহার করতে হয়, তা সে জানে না।

তৃতীয় একজন ব্যক্তি একশ' টাকার নোটটি দেখেই হয়ত তুলে নিল এবং যে সেটা হারিয়েছে তার কাছে পৌছে দিল। তা হলে এই লোকটি চুরিও করল না আবার একশ টাকার নোটটা তুলে নিয়ে মালিকের কাছে পৌছে দিয়ে নিঃসন্দেহে সে সততা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল।

শুধু পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে অর্থ সাম্যবাদীদের কাছে হস্তান্তরিত করলেই জগতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ আগেই দেখা গেছে যে, সাম্যবাদীরা সম্পদ পাওয়া মাত্র নিজেদের ভোগের জন্য তা ব্যবহার করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই জাগতিক সকল সম্পদের একমাত্র মালিক। আর সকল জীবেরই–সে মানুষই হোক আর পশুই হোক, জীবন ধারণের জন্য যে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করে, সে সাম্যবাদীই হোক বা পুঁজিবাদীই হোক, সে নিঃসন্দেহে চোর এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

জগতের সমস্ত সম্পদ, সকল জীবের কল্যাণেই ব্যবহৃত হবে এবং এটাই প্রকৃতি দেবীর ইচ্ছা। প্রত্যেক জীবেরই ঈশ্বরের সম্পদ গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্পদ যথাযথ ব্যবহারে পারদর্শী হলেই লোকে আর অন্যের সম্পদে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করবে না। তখনই এক আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। সেই রকম পারমার্থিক সমাজের মূল নীতি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে–

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

"ব্রহ্মাণ্ডের জড় ও জড়াতীত সকল বস্তুরই নিয়ন্তা ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর একমাত্র মালিক। তাই একমাত্র মালিককে স্মরণ করে প্রত্যেকেরই উচিত শুধু নিজ নিজ বরাদ্দ গ্রহণ করা এবং অপরাপর সামগ্রী কোনটি কার অধিকারভুক্ত, তা ভালভাবে জেনে নিয়ে, সেগুলি গ্রহণ করা অনুচিত।"

কৃষ্ণভক্তগণ ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীভগবানের এই সংসারে কোন জীবের জীবন ও সম্পদে অবৈধ হস্তার্পণ না করে, সকলের জীবন ধারণের প্রয়োজনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ থাকায়, সরল জীবন ও পরমার্থ চিন্তায় সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত যাদের হরিকথায় বিশ্বাস নেই, যাদের পারমার্থিক উন্নতিতে আগ্রহ নেই, সেই বিষয়ীরা শুধুমাত্র নিজেদের ভোগবৃদ্ধির জন্য তারা নিত্য নতুন সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি মতবাদের উদ্ভাবন করছে। তাদের হরিকথায় অনুরাগ নেই, তাদের জীবনের কোন উন্নত লক্ষ্যও নেই। অসংখ্য ভোগবাসনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং পরপ্রবঞ্চনায় তারা সুনিপুণ।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রদর্শিত পথে (অত্যাহার ইত্যাদি) প্রাথমিক দোষ থেকে মুক্ত হলেই, মানব, ইতর জীব, সাম্যবাদী, পুঁজিবাদীদের পারস্পরিক শত্রুতার অবসান হবে। শুধু তাই নয়, সব রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য অশান্তিরও অবসান হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক পারমার্থিক শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারাই এই শুদ্ধ ভাবনার উদয় হবে।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এমন একটি পারমার্থিক সমাজ গড়ে তুলছে যা সমগ্র বিশ্বে একটি শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তাই বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রেরই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে মনে প্রাণে শরণ নিয়ে, ভগবৎ-সেবায় ছ'টি প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত হয়ে নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করা উচিত।

শ্লোক ৩

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাত্তত্তৎ কর্ম-প্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥ ৩ ॥

শব্দার্থ

উৎসাহাৎ—উৎসাহের দ্বারা; **নিশ্চয়াৎ**—দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা; **ধৈর্যাৎ**—ধৈর্যের সঙ্গে; **তত্তৎকর্ম**—ভক্তিযোগের অনুকূলে বিভিন্ন কর্মাদি; **প্রবর্তনাৎ**—সম্পাদনপূর্বক; **সঙ্গ-ত্যাগাৎ**—অভক্তের সঙ্গ ত্যাগের দ্বারা; **সতঃ**—পূর্বতন মহান্ আচার্যবর্গের; **বৃত্তেঃ**—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **ষড়ভিঃ**—এই ছয়টি দ্বারা; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **প্রসিধ্যতি**—সিদ্ধি লাভ করেন।

অনুবাদ

ভক্তিযোগে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সেবাকার্য সম্পাদন করার অনুকূলে ছ'টি প্রধান নিয়ম বা বিধি বর্তমান আছে। যথা, সেবাকার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য-ধারণ, নববিধা ভক্তির বিধি অনুসারে সেবাকার্য সম্পাদন, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ, পূর্বতন আচার্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ। এই ছয়টি বিধি অনুসারে পারমার্থিক জীবন-যাপন করলে ভক্তিযোগে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

তাৎপর্য

শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তি তর্কপন্থা বা ভাবপ্রবণতা দ্বারা লাভ করা যায় না। একমাত্র ভগবৎ-সেবা বা ভজন দ্বারাই শ্রীভগবানের চরণ লাভ করা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (১/১/১১) শুদ্ধ-ভক্তির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

"জ্ঞান, কর্ম আদি অন্য অভিলাষ সকল শূন্য হয়ে, অনুকূলে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তম কৃষ্ণভক্তি।"

'ভক্তি' অনুশীলন সাপেক্ষ। কৃষ্ণ অনুশীলন মানেই কৃষ্ণকর্ম বা কৃষ্ণসেবা। ভণ্ড যোগীদের অলস ধ্যান ধারণা দ্বারা ভগবৎ অনুশীলন হয় না। ধ্যান অভ্যাস করে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না, অন্য কিছু লাভ হতে পারে। তবে জড় কর্ম, জড় ভাবনা থেকে মুক্তির জন্য কখনও কখনও অবশ্য ধ্যান-ধারণা শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয়। ধ্যান মানেই সব রকম জড় কর্মের অবসান। অন্তত সাময়িকভাবে তা সম্ভব। কিন্তু ভগবদ্ভজনে শুধু যে জড় কর্মের অবসান হয় তাই নয়, ভজনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও অর্থপূর্ণ, শুদ্ধ ভক্তিময়, ভগবৎ পরায়ণ হয়ে ওঠে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন–

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

ভগবদ্ভজনে নয়টি বিধি হচ্ছে–

১) শ্রীভগবানের নাম ও মহিমা শ্রবণ,
২) ভগবৎ মহিমা কীর্তন,
৩) ভগবৎ স্মরণ,
৪) ভগবৎ পাদসেবন,
৫) শ্রীবিগ্রহের অর্চন,
৬) ভগবৎ বন্দনা,
৭) ভগবৎ পদে দাস্যসেবা,
৮) ভগবৎ সখ্যতা,
৯) ভগবৎ পদে আত্মনিবেদন।

'*শ্রবণম্*' বা শ্রবণ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের প্রথম পদক্ষেপ। অনধিকারী ব্যক্তির নিকট ভগবৎ কথা শ্রবণ করা উচিত নয়। ভগবদ্‌গীতা অনুসারে সদ্‌গুরুই দিব্যজ্ঞান দানে একমাত্র অধিকারী।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় লও। দীনভাবে তাঁর সেবা কর; আত্মবিৎ তত্ত্বদর্শী গুরুদেব অনুসন্ধিৎসু শিষ্যকে দিব্যজ্ঞান দান করতে পারেন।" আবার মুণ্ডক *উপনিষদে* উল্লেখ আছে–

তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ

অর্থাৎ "দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য বৈধ ও সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।" তাই আমরা দেখেছি দীনভাবে শ্রীগুরুর সেবা করেই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানচর্চায় বা তর্কপন্থায় তা হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বলেছেন "

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)

জীব মাত্রই স্বরূপত আনন্দময়; জড় সুখের মায়াজালে তারা আবদ্ধ থাকে। মায়ামুক্তির পথ তারা জানে না। তাই তারা দেহ থেকে দেহান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে তথা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে সে এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে। শুদ্ধ ভক্তের কাছে হরিকথা শ্রবণ করে সে ভগবদ্ভজনের পথে অগ্রসর হয়। একমাত্র সজ্জন ব্যক্তিই এইরকম সুযোগ লাভ করে। অধুনা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সেই সুযোগ মানবজাতির কাছে মুক্তভাবে বিতরণ করছে। ভাগ্যক্রমে কেউ যদি এই সুযোগ গ্রহণ করে ভগবদ্ভজনে রত হয়, তাহলে তার মুক্তির পথ তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত হবে।

ভগবৎ-দর্শন করতে হলে, বৈকুণ্ঠ লাভ করতে হলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। উৎসাহের সঙ্গে ভগবদ্ভজন করতে হবে। যেখানে উৎসাহ সেখানেই সাফল্য। সংসারে যে কোন কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন

বিপুল উৎসাহ। ছাত্র, ব্যবসায়ী, শিল্পী যে কেউই হোক না কেন, উৎসাহ ছাড়া কেউই জীবনে উন্নতি করতে পারে না। সেই রকম ভগবদ্ভজনের চাই অদম্য উৎসাহ। উৎসাহ মানেই কর্ম; কার জন্য কর্ম? উত্তর হচ্ছে—*কৃষ্ণার্থাখিল চেষ্টা* (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু), অর্থাৎ প্রত্যেকেরই কর্ম করা উচিত শ্রীকৃষ্ণের জন্য।

ভক্তিযোগে সাফল্য লাভের জন্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সদ্গুরুর নির্দেশানুযায়ী ভগবদ্ভক্তগণের ভগবৎ সেবা করতে হবে। এর জন্য নিজ কর্মে শিথিলতা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত, তাই ভগবৎ সেবায় সর্বব্যাপী হওয়া চাই। সবই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। ভগবান নিজেই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) তা ব্যক্ত করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগৎ অব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

"আমি অব্যক্ত মূর্তিতে সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত। সমস্ত জীব-কুল আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের ভিতর অবস্থিত নই।"

সদ্গুরুর আদেশে কৃষ্ণসেবার অনুকূলে সব কাজ করতে হবে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—এখন আমরা dictaphone যন্ত্র ব্যবহার করছি। যে বিজ্ঞানী এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি এটি সাহিত্যিক, ব্যবসায়ীদের পার্থিব কার্যের জন্য তৈরি করেছিলেন। ভগবৎ সেবায় ব্যবহারের জন্য নিশ্চয় তিনি এটা উদ্ভাবন করেননি। কিন্তু আমরা কৃষ্ণভাবনাময় সাহিত্য রচনার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করছি। তবে একথা সত্য যে যন্ত্রটির উদ্ভাবন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত। ভৌতিক প্রকৃতির মূল উপাদান হচ্ছে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ; এই শক্তিগুলির মূল সমন্বয় ও সংযোগ বিক্রিয়ায় যন্ত্রটির প্রতিটি অংশ এবং ইলেকট্রনিক্সে কাজ চলেছে। এই যন্ত্রটির আবিষ্কারক যে মস্তিষ্কের সাহায্যে এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন, সেই মস্তিষ্ক ও তার উপাদান ভগবান শ্রীকৃষ্ণই

প্রদান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি* অর্থাৎ "সমগ্র সৃষ্টি আমার শক্তিতে আশ্রিত"। এইভাবে কৃষ্ণভক্ত অনুভব করে যে, সব কিছুই কৃষ্ণভক্তির অধীন হওয়ায় তা কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করা উচিত।

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনে প্রয়াসই 'উৎসাহ'। সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে ভগবৎ সেবায় নিয়োগের উপায় কেবল ভক্তেরাই উদ্ভাবন করতে পারেন (নির্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যম্ উচ্যতে)। নিষ্ক্রিয় অলস ধ্যানযোগ দ্বারা ভগবদ্ভজন হয় না। ভগবৎ সেবা মানে গতিশীল কৃষ্ণকর্ম, আর সেই হল পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি তথা পুরোভূমি।

ধৈর্যের সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করতে হবে। ধৈর্যহীনের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। এই কৃষ্ণভাবনা আন্দোলন প্রথমে এককভাবে শুরু হয়। প্রথমে কেউই আমার ডাকে সাড়া দেয়নি, তথাপি আমি ধৈর্য্যের সঙ্গে ভগবৎ বাণীর প্রচার চালিয়ে যাই। ধীরে ধীরে লোকেরা এই আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভব করল, আর তারা সাগ্রহে কৃষ্ণকথা প্রচারে অংশ গ্রহণ করছে। তাই ধৈর্যের সঙ্গে গুরুর উপদেশানুযায়ী ভগবৎ সেবা করতে হবে। তাই সাফল্যজনকভাবে কৃষ্ণানুশীলনের জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তা এবং ধৈর্যশীলতা। এটা খুব স্বাভাবিক যে, বিবাহ হওয়া মাত্র প্রত্যেক স্ত্রীলোকই অতি শীঘ্র সন্তান আশা করে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। স্বামীর কাছে অবশ্যই আত্মসমর্পণ করতে হবে। তা হলে সে নিশ্চিত গর্ভবতী হয়ে একদিন সন্তান লাভ করবে। সেই রকম ভগবৎ সেবায় আত্মসমর্পণ মানেই দৃঢ় বিশ্বাস। যেখানে ভক্ত চিন্তা করেন ঃ *অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ*—শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় আমাকে রক্ষা করবেন ও শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভে কৃপা করবেন। একেই বলে দৃঢ় নিশ্চয়তা বা দৃঢ় বিশ্বাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আলস্য জড়তা ত্যাগ করে উৎসাহের সঙ্গে বৈধী ভক্তির নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে (তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ)। নিয়ম-কানুন পালনে অবহেলা করলে ভক্তিনাশ হবে। এই কৃষ্ণভাবনা আন্দোলনের চারটি মূল

বিধি হল–(১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, (২) মাংসাহার, (৩) জুয়া খেলা ও (৪) মাদক দ্রব্য–অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে ভক্তিসাধনার অগ্রগতি নিশ্চয় অবরুদ্ধ হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই বলেছেন–*তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ* অর্থাৎ বৈধী ভক্তিসাধনার নিয়ম-কানুনগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হবে। এই চারটি নিষেধ (যম) ছাড়া আরও বিধি (নিয়ম) আছে; যেমন প্রতিদিন সদ্গুরুর প্রদত্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক মহামন্ত্র জপ করতে হবে। ঐ সব বিধি নিষেধ আন্তরিকভাবে ও উৎসাহের সঙ্গে অবশ্যই পালন করতে হবে। একেই বলে *তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ।* এ ছাড়া আরও বিধি আছে। ভগবৎ সেবায় সাফল্য লাভের জন্য অবশ্যই অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞানী, যোগী এবং অভক্তের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। একজন গৃহস্থ ভক্ত একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বৈষ্ণবাচার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, "অসৎসঙ্গ ত্যাগ– এই বৈষ্ণব আচার", বিশেষভাবে তিনিই বৈষ্ণব যিনি অবৈষ্ণব ও বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন "তাদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস"–শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ করে ষড়্-গোস্বামী ও পূর্ব আচার্যদের দেওয়া বিধিনিষেধ পালন করতে হবে। শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে বসবাস করলে, অবৈষ্ণব সঙ্গের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ভক্তসঙ্গে বসবাস করে পরমার্থ জীবনের বিধি-নিষেধ পালন করে পরমার্থ সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ বিশ্ববাসীকে তাদের কেন্দ্রগুলিতে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

ভগবৎ ভজন অপ্রাকৃত কর্ম। অপ্রাকৃত ভূমি নির্মল; সেখানে সত্ত্ব, রজো, তমোগুণের কোন স্থান নেই। গুণাতীত এই ভূমির আর এক নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব। আমাদের এই কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনে সকলেই সকাল চারটার মধ্যে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর প্রত্যেকে মঙ্গল-আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, এবং

কীর্তনাদিতে যোগদান করে। এইভাবে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণকথার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়। একে বলা হয় *সতোবৃত্তি* অর্থাৎ পূর্বতন আচার্যদের মহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিটি মুহূর্তকে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মে নিয়োজিত করতে হবে।

কেউ যদি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের এই শ্লোকের উপদেশানুসারে অর্থাৎ উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস, ধৈর্য, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, বিধি নিয়ম পালন, ও ভক্তসঙ্গে থেকে কঠোর ভাবে পারমার্থিক জীবন যাপন করতে পারেন, তা হলে তাঁর সাধনার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর বলেছেন, তর্কপন্থায় জ্ঞান-চর্চা, কর্মকাণ্ড দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি ও যোগসিদ্ধি কামনাদি সবই শুদ্ধ হরিভক্তি লাভের অন্তরায়। তাই এইসব অনিত্য কর্মে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বৈধীভক্তি অনুশীলনে যত্নশীল হতে হবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* অনুসারে–

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

"সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তা রাত্রিস্বরূপ।" *(ভঃ গীঃ ২/৬৯)*

কিন্তু যে ভগবৎ সেবা ছাড়া অন্য পথকে অনুসরণ করার প্রয়াস করে, তার চিত্ত-চাঞ্চল্য ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না। ভগবৎ সেবাই জীবের জীবন ও প্রাণ। ভগবৎ ভজনই জীবের লক্ষ্য। আর ভগবৎ ভজনের মধ্যেই নিহিত আছে চূড়ান্ত সাফল্য। যার এই বিশ্বাস সুদৃঢ় আছে সে নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছে যে, জ্ঞান কর্ম ও যোগ পন্থায় লক্ষ্যে পৌছান যাবে না, কারণ ভগবদ্ভক্তির কোন সন্ধানই তাদের জানা নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত আছে যে, "এই

বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, ভগবদ্ভক্তিহীন কঠোর তপস্যায় যারা রত, যে উদ্দেশ্যেই তারা তপস্যা করুক না কেন, তাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়।"

সপ্তম স্কন্ধে আরও লেখা আছে যে, "জ্ঞানী, কর্মীরা কৃচ্ছ্রসাধনা ও কঠোর তপস্যা করলেও শ্রীভগবানের চরণসেবা না করায় তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।" কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পতন নেই। শ্রীভগবান ভগবদগীতায় (৯/৩১) অর্জুনকে দৃঢ়ভাবে বলেছেন, "হে অর্জুন! উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের বিনাশ নেই–কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। আবার *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

"ভগবৎ ভজনে ক্ষয় বা ব্যয় নেই। সামান্যমাত্র ভগবৎ ভজনেও মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।" *(ভ ঃ গীঃ ২/৪০)*

ভগবৎ ভজন যেমন পবিত্র, তেমনই পূর্ণাঙ্গ। তাই একবার ভজন শুরু করলে ভক্ত একদিন নিশ্চয় সবলে অন্তিম লক্ষ্যে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নীত হবে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কখনও কখনও ভাবপ্রবণতাবশত সংসারের জড় কর্ম ছেড়ে কেউ কেউ ভগবৎ চরণে আশ্রয় নেয়। আর এইভাবেই শুরু হয় তার প্রাথমিক ভগবৎ সেবা। আর অপরিণত অবস্থায় যদি তার পতনও হয়, তা হলে তার কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ভগবৎ সেবা করে না, শুধু বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে, সে কিছুই লাভ করে না। আর পতিত ভক্ত পর জন্মে নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করলেও তার ভক্তির ক্ষয় হয় না–সে পূর্ব জন্মের অসমাপ্ত ভজন আবার শুরু করে। ভক্তি অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, অর্থাৎ জড় কার্যের দ্বারা ভক্তির উদয় বা নাশ হয় না। জড় কারণ ভগবৎ ভজনে বাধাও দিতে পারে না। তাই কর্ম, জ্ঞান ও যোগে অনাসক্ত হয়ে, ভক্তকে কেবল ভগবৎ ভজনেই দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হবে।

নিঃসন্দেহে কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীর অনেক উত্তম গুণাবলী আছে, কিন্তু কোন প্রকার প্রয়াস ছাড়াই ভক্ত হৃদয়ে এইসব গুণাবলী স্বতঃই উদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৮/১২) তার উল্লেখ আছে। দেবতাদের সমস্ত গুণাবলীই ভজনে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। কারণ ভক্তের জড়কর্মে আসক্তি নেই, তাই সে নির্মল। ভজনের সঙ্গে সঙ্গেই তার দিব্য জীবন শুরু হয়। কিন্তু জ্ঞানী, যোগী, কর্মী লোকহিতৈষী, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি যারা জড় কর্মে রত তারা কখনও মহাত্মার উচ্চাসন পেতে পারে না। তারা সবাই দুরাত্মা। *শ্রীমদ্ভগবদগীতায়* (৯/১৩) বলা হয়েছে–

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

ভজন্ত্যনন্যমনসো-জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, যে সব মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমাকে পরম, আদি এবং অব্যয় জ্ঞান করে আমার সেবায় সতত নিয়োজিত আছেন, তাঁরা আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ে সুরক্ষিত।"

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর সব ভক্তকেই রক্ষা করেন। তাই ভগবদ্ভজন ত্যাগ করে কর্ম, জ্ঞান বা যোগের পথ গ্রহণ না করে এই শ্লোক অনুযায়ী উৎসাহ, ধৈর্য, বিশ্বাস নিয়ে বৈধীভক্তি অনুশীলন করলে সকল বাধা দূর হয়ে অচিরেই ভজনে উন্নতি হবে।

শ্লোক ৪

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

শব্দার্থ

দদাদি— দান করেন; **প্রতিগৃহ্নাতি**—বিনিময়ে গ্রহণ করেন; **গুহ্যম্**—গুহ্য বা গুপ্ত বিষয়; **আখ্যাতি**—ব্যক্ত করেন; **পৃচ্ছতি**—জিজ্ঞাসা করেন; **ভুঙ্‌ক্তে**—আহার করেন; **ভোজয়তে**—আহার করান; **চ**—ও; **এব**—নিশ্চয়; **ষড্ বিধম্**—ছয় প্রকার; **প্রীতি**—প্রীতি বা ভালবাসা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তার নিকট হতে কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তার নিকট হতে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করান-ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই ছয়টি প্রধান লক্ষণ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তসঙ্গে ভগবৎ সেবার বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ভক্তসঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যথা-

(১) ভক্তকে কিছু দান করা,
(২) ভক্তের প্রতিদান গ্রহণ করা,
(৩) ভক্তের মনের কথা অন্য ভক্তকে ব্যক্ত করা,
(৪) অন্য ভক্তের মনের কথা শোনা,
(৫) ভক্তের দেওয়া ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করা,
(৬) ভক্তকে ভগবৎ প্রসাদ প্রদান করা।

একজন নবীন ভক্ত অপর একজন প্রবীণ ভক্তের কাছে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করবে। একেই বলা হয় *গুহ্যম্ আখ্যাতি পৃচ্ছতি*। প্রসাদ হচ্ছে ভগবানের কৃপা; এই মনোভাব নিয়ে আমাদের পারমার্থিক উন্নতির জন্য তা শুদ্ধভক্তের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকে গৃহে আমন্ত্রণ করে তাঁকে ভগবৎ প্রসাদ নিবেদন করে সর্বদাই তাঁর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা উচিত। তাই বলা হয়েছে *"ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব"*।

এমন কি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ও প্রীতি বিনিময়ের জন্য এই ছয়টি আচরণ-বিধি একান্ত প্রয়োজন। যেমন ব্যবসায়ী অন্য একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাইলে, সে তাকে এক প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করে; ভোজসভায় সে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং এ বিষয়ে সে তার অতিথি ব্যবসায়ীর মতামত জানতে চায়। কখনো কখনো তাদের মধ্যে উপহার বিনিময় হয়। এইভাবে প্রীতি বিনিময় উৎসবে এই ছয়টি আচার লক্ষিত হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন-*সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ*, অর্থাৎ বিষয়ীর সঙ্গত্যাগ করে ভক্তসঙ্গ করতে হবে। এই ছয় প্রকার প্রীতি বিনিময়ের জন্যই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ স্থাপন করা হয়েছে। এই সংঘ প্রথমে একক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হত, কিন্তু জনসাধারণ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হয়ে আদান-প্রদান করায়, বিশ্বময় এই সংঘ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, সংঘের উন্নয়ন কার্যে জনসাধারণ উদারভাবে দান করছেন। বিনিময়ে এই সংঘ কৃষ্ণভাবনাময় গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সামান্য যা কিছু দান করছে, জনসাধারণ সাগ্রহে তা গ্রহণ করছেন। কখনো কখনো আমরা 'হরেকৃষ্ণ মেলা'র আয়োজন করে 'আজীবন সভ্য' এবং 'কৃষ্ণানুরাগী'দের প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য আপ্যায়িত করি। আমাদের এই সভ্যেরা সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে আসা সত্ত্বেও সংঘ-প্রদত্ত সামান্য প্রসাদ তাঁরা গ্রহণ করেন। কখনো কখনো

ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরা ভগবৎ সেবা প্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। আমরাও তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এইভাবে বিশ্বময় এই সংঘের প্রসার এবং ভগবৎ বাণীর প্রচার সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। আর তার ফলে বিশ্বের বিদ্বান সমাজ এই কৃষ্ণভাবনামৃতের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সংঘের সভ্যদের মধ্যে এই ছয় রকম প্রীতি বিনিময়ের মাধ্যমে সংঘের জীবন পুষ্ট হচ্ছে। তাই প্রত্যেকের উচিত কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করা, কারণ এইভাবে প্রীতি বিনিময় দ্বারা একজন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেও কৃষ্ণভক্তির পুনরুদয় হবে। *ভগবদ্গীতায়* (২/৬২) শ্রীভগবান বলেছেন–*সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ*-অর্থাৎ সঙ্গ অনুসারে ইচ্ছা বা কামনার উদয় হয়। প্রবাদ আছে যে, সঙ্গ থেকে মানুষকে জানা যায়। তাই একজন সাধারণ ব্যক্তি ভক্তসঙ্গ করলে সেও একদিন নিশ্চয় ভক্ত হবে। কৃষ্ণচেতনা সকল জীবের অন্তরেই সুপ্ত অবস্থায় আছে। কিন্তু যে মনুষ্যদেহ লাভ করেছে, তার কৃষ্ণভাবনা ইতিমধ্যেই কিছুটা বিকশিত হয়েছে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ২২/১০৭) লেখা আছে–

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

"বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সকলের হৃদয়েই চিরকাল আছে। হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা হৃদয় নির্মল হলে অচিরেই জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। কৃষ্ণসেবা জীবের জন্মগত অধিকার। তাই সকলকে কৃষ্ণকথা শোনার সুযোগ দেওয়া উচিত। শুধু "শ্রবণ-কীর্তন' করে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়।" কৃষ্ণভক্তি সব সময় সকলের হৃদয়ে রয়েছে, কৃত্রিমভাবে তা জীবের হৃদয়ে আরোপ করা যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন করলে জীবের চিত্তদর্পণ নির্মল হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকের প্রথম স্তবকে বলেছেনঃ

চেতোদর্পণ মার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের জয় হোক, যা চিত্তরূপ দর্পণের কলুষ মার্জন করে এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে আবর্তিত ভব-জীবনের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে নির্বাপণ করে। সংকীর্তন যজ্ঞ মানব জীবনের পরম আশীর্বাদ স্বরূপ কারণ তা নির্মল চন্দ্রকিরণের ন্যায় মঙ্গলময়। তা দিব্য জ্ঞানের প্রাণস্বরূপ, দিব্য-আনন্দ বর্ধনকারী এবং তা আমাদের পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন দান করে, যা লাভ করার জন্য আমরা সর্বদাই ব্যগ্র।"

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তনকারীরই যে চিত্ত শুদ্ধ হয় এমন নয়, যে কীর্তন শোনে তারও চিত্ত নির্মল হয়। এমন কি এই বৈকুণ্ঠনাম, মহামন্ত্র কীর্তন শুনে কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, গাছপালাদি মনুষ্যেতর জীবও শুদ্ধ হয়। তারাও কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনুষ্যেতর জীবের মায়ামুক্তির উপায় সম্বন্ধে হরিদাস ঠাকুরকে প্রশ্ন করলে, উত্তরে তিনি বলেন যে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নামেই তাঁর সর্বশক্তি নিহিত আছে। তাই গভীর জঙ্গলেও পবিত্র নাম কীর্তন করলে সেখানকার গাছপালা, পশু-পাখি শুধু অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম শুনেই কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন লীলাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যখন ঝারিখণ্ডের বনে কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হয়ে কীর্তন করতে করতে যাচ্ছিলেন, তখন বাঘ, হরিণ, সর্পাদি বনের সমস্ত পশুই হিংস্রভাব ভুলে মহাপ্রভুর সঙ্গে নাম সংকীর্তনে যোগ দেয়, এবং নৃত্যগীত করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সকল অপ্রাকৃত লীলা আমরা অনুকরণ করতে পারি না, কিন্তু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের প্রত্যেকের উচিত। আমাদের এমন

শক্তি নেই যার দ্বারা আমরা বনের পশু-বাঘ, সাপ, কুকুর, বিড়াল সবাইকে নাচাতে পারি। অথচ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে বিশ্বময় বহু লোককে আমরা কৃষ্ণভাবনাময় করে তুলতে পারি। ভগবানের পবিত্র নাম বিতরণ করা–*'দদাতি'* শব্দের একটি দিব্য উদাহরণ। আবার প্রীতি-বিনিময় নীতি অনুযায়ী ভক্তের দান গ্রহণে আমাদের আগ্রহান্বিত হতে হবে। কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে এবং সংসারবন্ধন সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসু হতে হবে। এইভাবেই গুহ্যম *'আখ্যাতি পৃচ্ছতি'* নীতি পালন করা যায়।

বিশ্বময় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে প্রতি রবিবার মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। বহু আগ্রহী জনসাধারণ উৎসবে যোগদান করেন ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। আবার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও ভক্তদের কখনো কখনো স্বগৃহে আমন্ত্রণ করেন ও প্রচুর প্রসাদ দ্বারা তাদের আপ্যায়িত করেন। এইভাবে ভক্ত ও জনগণ উভয়েই উপকৃত হয়। তথাকথিত যোগী, জ্ঞানী, কর্মী ও জনহিতৈষীদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, কারণ তাদের সঙ্গ দ্বারা কারও নিত্য মঙ্গল সাধিত হয় না। কিন্তু যদি সব সময় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করা যায়, তা হলে ভগবৎ প্রেম খুব সহজেই লাভ হয় এবং জীবনও সফল হয়। এখন একমাত্র এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনই সারা জগতে ভগবৎ প্রেম শিক্ষা দিচ্ছে। ধর্মাচরণ মানবজাতির একটি বিশেষ কর্তব্য। ধর্ম আছে বলেই মানুষ ও পশুতে এত প্রভেদ। পশু সমাজে ধর্মনীতি নেই, তাদের মন্দির বা গির্জাও নেই। আর জগতে মানুষ যত পতিতই হোক, তাদের অবশ্য একটি বিশেষ ধর্ম আছে। এমন কি জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবনও এক নির্দিষ্ট ধর্মপথে চালিত হয়। যখন ধর্ম বিকশিত হয়ে ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হয়, তখনই তা সফল হয়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে–

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা লাভ করাই হল মানুষের পরম ধর্ম। আত্মাকে প্রসন্ন করার জন্য এমন ভগবৎ-সেবা অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা হওয়া উচিত।"

মানবজাতি যদি বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করতে চায়, তা হলে তাদের কৃষ্ণভাবনাভিত্তিক শিক্ষালাভ করতে হবে। কারণ এর দ্বারাই কেবল মানুষের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত হতে পারে। তাই জগদ্বাসী কৃষ্ণানুশীলন করলে অচিরেই সমগ্র বিশ্ব শান্তিময় ও আনন্দময় হয়ে উঠবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভগবৎ-ধর্ম প্রচারকদের বিশেষভাবে ভগবৎ-বিদ্বেষী মায়াবাদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন। প্রায় সারা বিশ্বই এখন মায়াবাদী ও নাস্তিকে পরিপূর্ণ; তাই রাজনৈতিক দলগুলিও এই সুযোগে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে জগতে জড় উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কখনও তারা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকার্য রোধ করার জন্য কোন শক্তিশালী দলকে সাহায্য করছে। মায়াবাদী ও অন্যান্য নিরীশ্বরবাদীরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার কামনা করে না, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ভগবদ্ভক্তি প্রচার করে। নিরীশ্বরবাদীদের কাজ হচ্ছে প্রচারের বিরোধিতা করা। যেমন একটি সাপকে দুধ-কলা খাইয়ে কোন লাভ নেই কারণ *কেবলং বিষ বর্ধনম্*–অর্থাৎ দুধ কলা খেয়ে তার বিষই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সেই রকম ঈর্ষাপরায়ণ মায়াবাদ বা কর্মীদের কাছে আমাদের কথা কখনই প্রকাশ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণভাবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা মঙ্গলজনক। তাদের সঙ্গে ভগবতত্ত্ব বিষয়ে কোন রকম আলোচনাই না করা ভাল, কারণ তাঁরা ভক্তির অনুকূলে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনে সক্ষম নয়। এমন কি মায়াবাদী বা নাস্তিকদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও উচিত নয়। আবার তাদের নিমন্ত্রণ করাও উচিত নয়। কারণ তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ লাভে তাদের নাস্তিক মনোভাবের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হতে পারি। শাস্ত্রে আছে, *সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ*। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলেছিলেন, বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন। একমাত্র অত্যুন্নত ভক্তই

কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য সকলের দান গ্রহণ করতে পারেন, সেই জন্য মায়াবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের দান গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়। বাস্তবিক মহাপ্রভু সাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগীদের সঙ্গ পর্যন্ত সর্বদা ত্যাগ করতে বলেছেন।

তা হলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বৈধী ভক্তি অনুসারে সাধুসঙ্গে বসবাস করে ও মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সদ্‌গুরুর আদেশ ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় সম্পূর্ণভাবে পালন করা উচিত। একমাত্র এইভাবেই আমরা কৃষ্ণানুশীলন করে আমাদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি পুনরায় জাগ্রত করতে পারি। তাই যারা কনিষ্ঠ অধিকারী নয়, আবার মহাভাগবতও নয়, অর্থাৎ মধ্যম অধিকারী, তাদের উচিত-ভগবৎ বিগ্রহের সেবা করা, ভক্তদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা, অজ্ঞদের কৃপা করা, কিন্তু ভগবৎ-বিদ্বেষী ও অসুরদের সঙ্গ ত্যাগ করা। এই শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ শ্রীভগবানের সঙ্গে প্রীতি বিনিময় ও ভক্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। 'দদাতি' শব্দ ব্যবহার করে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন যে, উন্নত ভক্ত তাঁর নিজের জীবনে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যখন তিনি সংসার ত্যাগ করেন, তিনি তাঁর সম্পত্তির অর্ধাংশ কৃষ্ণ সেবায় দান করেন, এক-চতুর্থাংশ আত্মীয়দের সেবায় দান করেন। আর বাকি এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগত জরুরী-কালীন অবস্থার জন্য রেখে দেন। এই দৃষ্টান্ত সকল ভক্তের অনুসরণ করা উচিত। প্রত্যেকের আয়ের অর্ধাংশ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত সেবায় ব্যয় করা উচিত। এখানেই 'দদাদি' শব্দের সার্থকতা।

পরের শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ কি ধরনের বৈষ্ণবকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে হয় ও কিভাবে বৈষ্ণব-সেবা করতে হয়, সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৫

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥

শব্দার্থ

কৃষ্ণ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম; **ইতি**—এইভাবে; **যস্য**—যার; **গিরি**—বাক্যে; **তম্**—তার; **মনসা**—মনের দ্বারা; **আদ্রিয়েত**—আদর করা উচিত; **দীক্ষা**—দীক্ষা; **অস্তি**—হয়; **চেৎ**—যদি; **প্রণতিভিঃ**—প্রণামাদির দ্বারা; **চ**—ও; **ভজন্তম্**—ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্ত; **ঈশম**—পরমেশ্বর ভগবানের নিকট; **শুশ্রূষয়া**—প্রত্যক্ষ সেবার দ্বারা; **ভজন-বিজ্ঞম্**—যিনি ভজনে উন্নত; **অনন্যম্**—নিরবচ্ছিন্নভাবে; **অন্যনিন্দাদি**—অন্যের নিন্দা ইত্যাদি; **শূন্য**—সম্পূর্ণ বর্জিত; **হৃদম্**—যাঁর হৃদয়; **ঈপ্সিত**—আকাঙ্খিত; **সঙ্গ**—সঙ্গ; **লব্ধ্যা**—লাভের দ্বারা।

অনুবাদ

যে ভগবদ্ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তাঁকে মনে মনে আদর করা উচিত এবং যিনি দীক্ষিত হয়ে শ্রীবিগ্রহের সেবায় রত আছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করা উচিত। আর যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রকৃত উন্নত, যার হৃদয় অন্যের নিন্দাদি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাঁর সঙ্গ করা উচিত এবং তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর সেবা করা উচিত।

তাৎপর্য

পূর্বের শ্লোকে প্রীতি-বিনিময়ের যে ছয়টি বিধির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভক্তের প্রতি প্রয়োগ করতে হবে, এবং সতর্কতার সঙ্গে

অধিকার ভেদে ভক্ত নির্বাচন করতে হবে। সেইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তের অধিকার নিরূপণ করে তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকে তিনি কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম এই তিন অধিকারীর সঙ্গে আচরণ-বিধির কথা বলেছেন। কনিষ্ঠ অধিকারী হচ্ছেন নবীন ভক্ত। তিনি সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ভগবানের নাম কীর্তন করার চেষ্টা করেন। এই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানান উচিত। আর মধ্যম অধিকারী সদ্‌গুরুর কাছে ব্রহ্ম-দীক্ষা লাভ করে অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় সর্বতা নিয়োজিত থাকেন, সুতরাং মধ্যম অধিকারী ভগবৎ অনুশীলনের মধ্যবর্তী স্তরে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হয়ে থাকেন। শ্রেষ্ঠ ভক্ত অর্থাৎ উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভজনের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন। তিনি কারও নিন্দা করেন না, তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণ নির্মল এবং তিনি বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধাবস্থা লাভ করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী সেই মহাভাগবত, শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে উপদেশ দিয়েছেন। ভগবৎ অনুশীলনের সর্বনিম্ন কনিষ্ঠ অধিকারীর স্তরে কারও থাকা উচিত নয়, কারণ শ্রীবিগ্রহের অর্চনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৭) কনিষ্ঠ অধিকারী সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেসু চান্যেসু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

"যে ভক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্দিরে শ্রীমূর্তির অর্চন করে, অথচ ভগবদ্ভক্ত বা জনগণের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করতে জানে না, তাকে প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলে।"

তাই সাধনায় উন্নতিকামী ভক্তকে কনিষ্ঠ থেকে মধ্যম অধিকারী হতে চেষ্টা করা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪৬) মধ্যম অধিকারীর এই রকম পরিচয় পাওয়া যায়—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

"মধ্যম অধিকারী শ্রীভগবানকে সবচেয়ে প্রিয় মনে করে ভগবৎ-সেবা করে, ভক্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, অজ্ঞকে কৃপা করে এবং ভগবৎ বিদ্বেষীদের সঙ্গ থেকে দূর থাকে।"

এইভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ভগবৎ-জীবন গড়ে তুলতে হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই শ্লোকে আমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন যে, কিভাবে নানাপ্রকার ভক্তের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। আমরা বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের বৈষ্ণব দেখতে পাই। এক ধরনের বৈষ্ণব আছে যারা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করে বটে, কিন্তু তারা মদ, স্ত্রীলোক ও অর্থের প্রতি আসক্ত। তাদের 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলা হয়। যদিও তারা হরিনাম করে কিন্তু তাদের হৃদয় শুদ্ধ নয়। এই সব বৈষ্ণবদের মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। যারা অজ্ঞ এবং অসৎসঙ্গ প্রভাবে অধঃপতিত তারা যদি শুদ্ধভক্তের সঙ্গ কামনা করে, তা হলে তাদের কৃপা করা উচিত। কিন্তু যারা সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে গুরুর আদেশ পালনে জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই নবীন ভক্তদের শ্রদ্ধা জানান উচিত।

জাতি, বর্ণ, আশ্রম নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে, কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। প্রসাদ সেবা করতে পারে এবং কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে পারে। তাই কেউ যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্ণভক্ত হতে চায়, দীক্ষা নিতে চায়, তা হলে আমরা তাকে পবিত্র হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষা দিই। এইভাবে কেউ হরিনাম দীক্ষা পেলে তখনই তাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রণাম করা উচিত। এইরকম বহু বৈষ্ণবের মধ্যে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভগবৎ সেবা করে কঠোরভাবে ভগবদ্ভজনের বিধি-নিষেধ পালন করে চলেন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ

করেন এবং সবসময় ভগবৎ বাণী প্রচারে সচেষ্ট থাকেন, তিনিই প্রকৃত উন্নত ভক্তরূপে বিবেচিত হন এবং তাঁকে উত্তম অধিকারী বলা হয়। সকলেরই উচিত তাঁর সঙ্গ কামনা করা।

যে উপায় অবলম্বন করে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়, তা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইভাবে বর্ণনা করা আছে–

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/১৯২)

"দীক্ষার সময় ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে আত্মসম জ্ঞান করেন।"

ভক্তিসন্দর্ভে (৮৬৮) শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে দীক্ষার বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন–

দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

"দীক্ষা গ্রহণের পর ক্রমশ জড় ভোগে বিরক্তি ও পরমার্থ জীবনে আসক্তি ও রুচি উৎপন্ন হয়।"

বিশেষভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেখানে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করার পরে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করে ভোগময় জীবনে বিরক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবন গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েছে। অতীব ধনীর সন্তান অথচ তারা এখন অতি সাধারণ জীবন যাপন করছে। এই জীবনে শারীরিক আরাম বলতে কিছুই নেই। বাস্তবিক শুধু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যতদিন বৈষ্ণব সঙ্গে মন্দিরে বসবাস করা যায়, ততদিন তারা যে কোন অবস্থায় জীবন যাপন করতে প্রস্তুত। এইভাবে সংসারে জীবনে বিরক্তি অনুভূতি হলেই একজন সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। পারমার্থিক জীবনে

উন্নতির উপায় ভাগবতে (৬/১/১৩) বর্ণনা করা হয়েছে–*তপসা ব্রহ্মচর্যেন শমেন চ দমেন চ*–"যে ঐকান্তিকভাবে দীক্ষা লাভ করতে চায়, তাকে তপস্যা করতে হবে। মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।" কেউ যদি এইসব সাধন করে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চায়, সে তখন দীক্ষালাভের যোগ্য হয়। দিব্যজ্ঞানকে পারমার্থিক ভাষায় তদ্‌বিজ্ঞান বা পরাবিদ্যা বলে। শাস্ত্রে আছে–

তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ।

অর্থাৎ "যিনি পরাবিদ্যা লাভে অনুসন্ধিৎসু, তাঁর সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।" কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৩/২১) বর্ণিত আছে–

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

অর্থাৎ "পরতত্ত্ব বিদ্যায় যথার্থ আগ্রহী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হবেন।" গুরুর চরণাশ্রয় লাভ করার পর অবশ্যই তাঁর আদেশ পালন করা উচিত। পরমার্থ জীবনকে আধুনিক কায়দা মনে করে যে কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ করা কখনোই উচিত নয়। পরমার্থীকে জিজ্ঞাসু হতে হবে, অর্থাৎ সাগ্রহে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সদ্‌গুরুর কাছে অনুসন্ধান করতে হবে। শাস্ত্রে আছে, প্রশ্ন সব সময় পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় হওয়া উচিত *(জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্)*। '*উত্তমম্*' শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ সেই বিদ্যা জড়াতীত। '*তম*' মানে অন্ধকার বা অবিদ্যা এবং 'উৎ' মানে অতীত; সাধারণ মানুষ মাত্রেই জড় বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু জড় বিষয়ে আগ্রহী না হয়ে যখন তারা পরমার্থমুখী হবে, তখনই তারা দীক্ষা লাভ করতে পারবে। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করে গভীর অভিনিবেশ সহকারে যে ভগবৎ সেবা করে, সেই ভক্তই মধ্যম অধিকারী।

মহামন্ত্র এতই মধুময় যে, যদি কেউ নিরপরাধে মহামন্ত্র কীর্তন করেন তিনি ভজনে উন্নতি করবেন এবং একদিন নিশ্চয় উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীভগবান ও

তাঁর পবিত্র নামে কোন প্রভেদ নেই। যিনি এই অনুভূতি লাভ করেছেন, তাঁকে নবীন ভক্ত মাত্রেই প্রণাম জানাবেন। আমাদের এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করা যায়, ততক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে যথার্থ উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ২২/৬৯) এ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, "যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে 'উত্তম'।" সকলকেই কনিষ্ঠ অধিকার থেকে ভজন শুরু করতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম জপ করতে হবে, এইভাবে ক্রমশ সাধনায় উন্নতি করতে করতে একদিন সর্বোচ্চ উত্তম অধিকারীর স্তর লাভ করা যাবে। বহু বিদেশীই বিরামহীনভাবে দীর্ঘ সময় হরিনাম করতে পারে না, তাই আমাদের এই আন্তর্জাতিক সংস্থায় সকল ভক্তের প্রতি অন্যূন পঁচিশ হাজার বার পবিত্র হরিনাম জপ করার নির্দেশ আছে। যদিও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন যে, অন্তত এক লক্ষ বার নাম জপ করতে না পারলে তাকে 'পতিত' মনে করতে হবে। এই বিচার ধারায় আমরা সকলেই প্রায় পতিত, কিন্তু যেহেতু আমরা নিষ্কপটে ও গভীর মনোনিবেশ সহকারে ভগবৎ সেবা করছি, তাই আমরা নিশ্চয় পতিতপাবন মহাপ্রভুর কৃপা আশা করতে পারি।

বৈষ্ণবের পরিচয় সম্বন্ধে পরম গৌরভক্ত শ্রীসত্যরাজ খানকে মহাপ্রভু বলেছিলেন–

প্রভু কহে, "যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,–শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১০৬)

মহাপ্রভু আরও বলেন–

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১১১)

আমাদের সংঘের একজন বন্ধু আছেন। তিনি একজন বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজ গায়ক। তিনি 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রে আকৃষ্ট হয়েছেন; এমন কি তাঁর রেকর্ডেও তিনি অনেকবার পবিত্র 'হরিনাম' কীর্তন করেছেন। তিনি তাঁর বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে পূজা করেন ও আমাদের কৃষ্ণভক্তদের শ্রদ্ধা করেন। দিব্য কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করেন; এই ধরনের বৈষ্ণব হৃদয়কেই সকলের প্রণাম জানানো উচিত। আমরাও তাঁকে প্রণাম জানাই। সিদ্ধান্ত এই যে, যিনিই প্রতিদিন পবিত্র হরিনাম কীর্তন করে কৃষ্ণানুশীলনে উন্নতি করছেন–তিনি সকলেরই নমস্য। পক্ষান্তরে, আমাদের সমসাময়িক অনেক মহান প্রচারকই ক্রমে ক্রমে বিষয় আবর্তে পতিত হয়েছেন,–কারণ তাঁরা কেউই হরিনাম কীর্তন করতেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময় মহাপ্রভু তিন প্রকার ভক্তের উল্লেখ করেছিলেন।

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৬৭)

"যিনি মধ্যম অধিকারী, তিনি ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন এবং তিনি ভক্তিপথে প্রকৃতই আরও উন্নতি করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লেখা আছে–

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'–শ্রদ্ধা অনুসারী॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৬৪)

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আরও লেখা আছে যে,

'শ্রদ্ধা'-শব্দে-বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৬২)

শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধাই কৃষ্ণানুশীলনের প্রথম শিক্ষা। তবে সাধনায় উন্নতির জন্য দৃঢ় শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস প্রয়োজন। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মাত্রই কোন রকম ভাষ্য ছাড়াই ভগবদ্গীতার বাণীকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করবেন। অর্জুন ঠিক এইভাবেই ভগবদ্গীতার বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা সকলেরই করা উচিত। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে অর্জুন বলেছিলেন–

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।

"হে কেশব! তুমি যা উপদেশ দিলে, তার প্রতিটি কথা আমি সত্য বলে গ্রহণ করেছি।"

ভগবদ্গীতার অর্থ বোঝার এই হচ্ছে উপায়, আর একেই বলে শ্রদ্ধা। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের খেয়াল খুশিমত ভগবদ্গীতার এক অংশকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করব, আর অন্য অংশ করব না। সমগ্র ভগবদ্গীতায় বিশেষ করে ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ *'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'*-(সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ লও), এই আদেশ গ্রহণ করার নামই শ্রদ্ধা। যখন কেউ সম্পূর্ণভাবে এই উপদেশে শ্রদ্ধাবান হয়, তখন সেই দৃঢ় শ্রদ্ধাই পরমার্থ জীবনের উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ হয়। যখন কেউ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হরিনাম কীর্তনে ব্রতী হয়, তখন সে ক্রমশ স্বরূপ উপলব্ধি করে। শ্রদ্ধাবান হরিকীর্তনকারীই ভগবৎ দর্শন লাভ করে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/২৩৪) লেখা আছে–

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

অন্য কোনভাবে বা কৃত্রিম উপায়ে ভগবৎ-সেবা অনুভূতি লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রদ্ধাবান হয়ে ভগবৎ সেবা করতে হবে। জিহ্বা দ্বারাই ভগবৎ সেবা শুরু হয় (সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ)। আমাদের সব সময়, পবিত্র হরিনাম কীর্তন করা উচিত। যখন আমরা শ্রদ্ধাবান হয়ে এইভাবে কৃষ্ণানুশীলন করব, তখন স্বয়ং ভগবান আমাদের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন।

জীবের 'স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্যদাস' এই উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য সব বিষয়েই তাঁর বিরক্তি অনুভূত হবে। তিনি কৃষ্ণমনা হবেন, কৃষ্ণনাম প্রচারের তিনি বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করবেন। তিনি চিন্তা করবেন, বিশ্বময় কিভাবে কৃষ্ণকথা প্রচার করা যায়। সেটাই জীবনের একমাত্র ব্রত। এই লক্ষণযুক্ত ভক্তকেই উত্তম অধিকারীরূপে স্বীকার করতে হবে এবং *'দদাতি', 'প্রতিগৃহ্নাতি'* প্রভৃতি প্রীতি-বিনিময়ের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গ করতে হবে। বাস্তবিক এই রকম একজন উত্তম অধিকারী বৈষ্ণবকেই গুরুরূপে বরণ করতে হবে। যথাসর্বস্ব তাঁর চরণে নিবেদন করতে হবে। কারণ এটাই শাস্ত্রের নির্দেশ। শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচারীর উচিত গুরুর জন্য ভিক্ষা করা ও ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে নিবেদন করা। কিন্তু আত্মবিৎ না হওয়া পর্যন্ত, আত্মজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত, মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করা উচিত নয়। কারণ উত্তম অধিকারীর অনুকরণ করার ফলে সাধারণ ভক্তের পতন হতে পারে।

তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই শ্লোকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, বুদ্ধি মত্তার সঙ্গে ভক্তেরা যেন উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর বিচার করেন। ভক্তেরও নিজ অধিকার বিচার করে চলা উচিত। উচ্চাধিকারীর আচরণ কখনই তার অনুকরণ করে চলা উচিত নয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উত্তম অধিকারীর লক্ষণ বর্ণনাকালে বলেছেন, যিনি বিশ্বময় পতিতদের উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই উত্তম অধিকারী। উত্তম অধিকার লাভ না হওয়া পর্যন্ত কারও গুরু হওয়া উচিত নয়। একজন কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারীও গুরু হতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর শিষ্য ও কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকার লাভ করবে–তার চেয়ে বেশি সাধনায় উন্নতি করতে পারবে না। তাই পরমার্থী মাত্রই সতর্কতার সঙ্গে গুরুরূপে একমাত্র উত্তম অধিকারীকে বরণ করবেন।

শ্লোক ৬

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্যপশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেন পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ ॥ ৬ ॥

শব্দার্থ

দৃষ্টৈঃ—সাধারণ দৃষ্টিতে; **স্বভাব-জনিতৈঃ**—স্বভাব দোষে দুষ্ট; **বপুষঃ**—দেহের; **চ**—এবং; দোষৈঃ-দোষের দ্বারা; ন—নয়; প্রাকৃতত্বম্—প্রাকৃত; **ইহ**—এই জগতে; ভক্ত-জনস্য—শুদ্ধভক্তের; **পশ্যেৎ**—দেখা উচিত; **গঙ্গাম্ভসাম্**—গঙ্গাজলের; ন—না; **খলু**—নিশ্চিত; **বুদ্বুদফেনপঙ্কৈঃ**—বুদবুদ, ফেনা ও পাঁকের দ্বারা; **ব্রহ্মদ্রবত্বম্**—অপ্রাকৃত তত্ত্ব; অপগচ্ছতি—অপচয়; **নীর-ধর্মৈঃ**—জলের ধর্ম।

অনুবাদ

একজন শুদ্ধ ভক্ত, যিনি তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবৎ চেতনা লাভ করেছেন, তিনি প্রাকৃত দৃষ্টিতে কোন কিছু দর্শন করেন না। এরূপ ভক্তকেও প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে কোন শুদ্ধভক্তকে নিচ-কুলোদ্ভব, কুৎসিত, বিকলাঙ্গ বা রোগগ্রস্ত বলে মনে হলেও তাঁকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর সেই দৈহিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো থাকতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্ত কখনও তার দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়েন না। এটা ঠিক গঙ্গাজলের মতো। গঙ্গাজল যেমন কখনও কখনও বুদবুদ, ফেনা বা কাদা-পাঁকের দ্বারা ঘোলা হয়ে যায়, কিন্তু তা বলে গঙ্গার জল অপবিত্র হয়ে যায় না এবং যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নত, তাঁরা গঙ্গাজলের গুণাগুণ বিচার না করেই পবিত্রতা লাভ করার জন্য সেই জলে স্নান করে থাকেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধা-ভক্তি অর্থাৎ ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা লাভ করাই আত্মার ধর্ম এবং মুক্ত অবস্থাতেই ভগবৎ-সেবা করা যায়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) লিখিত আছে–

মাং চ যোহব্যাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত থাকেন এবং কোন অবস্থাতেই ভগবৎ-সেবা থেকে বিরত হন না, তিনি অনায়াসে জড়-গুণ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন।"

অমিশ্র শুদ্ধ ভগবদ্ভজনই অব্যাভিচারিণী ভক্তি। যিনি ভগবদ্ভজন করছেন, তাঁকে জড় অভিলাষ মুক্ত হতে হবে। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ব্রতী হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য যদি হয় ভুক্তি, তবে আমরা জড় ভাবনাময় হব। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যদি হয় শ্রীকৃষ্ণ সেবা, তা হলে আমরা কৃষ্ণভাবনাময় হব। শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত ভক্তই অন্যাভিলাষিতাশূন্য হয়ে ভগবদ্ভজন করেন। *'জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতম্'*–অর্থাৎ দেহধর্ম ও মনোধর্মের উর্ধ্বে জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধহীন ভগবৎ সেবাই হল শুদ্ধ ভক্তিযোগ। আবার ভক্তিযোগই শুদ্ধ আত্মকর্ম; যিনি অমিশ্র, শুদ্ধ ভক্তিযোগ সাধন করেছেন, তিনি পূর্বেই মুক্ত হয়ে গেছেন *(স গুণান্ সমতীত্যৈতান)*। দেহ বিচারে আপাতদৃষ্টিতে মায়া-কবলিত মনে হলেও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা সব সময়ই মায়ামুক্ত। তাই তাঁদের কখনও জড়-দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। একজন শুদ্ধ ভক্তই অপর একজন ভক্তের হৃদয়কে উপলব্ধি করতে পারেন। আগের শ্লোকেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভক্ত তিন রকমের। যেমন, কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী।

একজন কনিষ্ঠ অধিকারী, ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন না। তিনি শুধু মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন। কিন্তু মধ্যম অধিকারী, ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। তাই তিনি শ্রীভগবান, ভক্ত ও অভক্তদের সেবা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেন।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের দৈহিক দোষ কারুর সমালোচনা করা উচিত নয়। তার দেহের কোন দোষ থাকলেও তা না দেখাই উচিত। আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী তা সদ্গুরুই বলতে পারেন–আর তা হচ্ছে শুদ্ধ ভগবৎ সেবা। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) লেখা আছে–

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ ॥

"যদি হঠাৎ কোন ভক্তকে কোন গর্হিত বা জঘন্য কর্মে রত দেখাও যায়, তথাপি তাকে সাধু বলেই বিবেচনা করতে হবে, কারণ তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তি নন।"

যদি জাত-গোঁসাই বা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না-ও হয় তথাপি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা উচিত নয়; প্রকৃতপক্ষে লৌকিক বিচার-সম্মত জাতি বা বংশানুক্রমে 'গোঁসাই' বা 'গোস্বামী' হওয়া উচিত নয়। শুদ্ধ ভক্তদেরই 'গোস্বামী' পদে একমাত্র অধিকার আছে। যেমন, ষড় গোস্বামীদের প্রধান শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী। তাঁরা পূর্বাশ্রমে প্রায় মুসলমানই হয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে। তাঁদের একজনের নাম রাখা হয়েছিল দবির খাস আর অন্য জনের নাম সাকর মল্লিক; কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং তাদের 'গোস্বামী' পদ দান করেন। তাই আমরা দেখছি 'গোস্বামী' পদ বংশানুক্রমিক নয়। যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করে ইন্দ্রিয়ের কর্তা হয়েছেন, 'গোস্বামী' শব্দে তাঁকেই বোঝায়। ভক্ত কখনও ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হন না, বরং তিনি ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করেন। তাই গোস্বামী বংশে জন্ম না হলেও তাঁকে 'গোস্বামী' বা 'স্বামী' বলা উচিত।

এই রীতি অনুযায়ী শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় এবং শ্রীঅদ্বৈত বংশীয়রা নিশ্চয়ই বৈষ্ণব, কিন্তু অন্যান্য বংশীয়দের প্রতিও আমাদের বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। পূর্ব আচার্যদের বংশধর বা সাধারণ বংশধর যে কোন ভক্তই হোক–সকলের ক্ষেত্রেই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া উচিত। ইনি আমেরিকান গোস্বামী, উনি নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামী ইত্যাদি বলে গোস্বামীদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ থেকে বিদেশি ভক্তদের 'গোস্বামী' পদ দেওয়ায় কোন কোন মহল প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধিতা করছে। এমন কি, কখন কখন জনসাধারণ স্পষ্টই বিদেশী ভক্তদের বলে যে, তাদের 'গোস্বামী' বা 'সন্ন্যাসী' পদ বৈধ নয়, শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের এই শ্লোক অনুসারে বিদেশী গোস্বামী বা পূর্ব আচার্য বংশীয় গোস্বামীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

পক্ষান্তরে যাঁরা 'গোস্বামী' পদ লাভ করেছেন অথচ নিত্যানন্দ বা অদ্বৈত আচার্য বংশীয় নন, তাঁদের মিথ্যা অভিমানে স্ফীত হওয়া উচিত নয়। তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মিথ্যা অভিমানী ও জড় অহঙ্কারীর পতন অনিবার্য। তাছাড়া কৃষ্ণভাবনা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব, সেখানে কোন ঈর্ষা বা মৎসরতার স্থান নেই। এ জন্যই শাস্ত্রে আছে, পরমং *নির্মৎসরাণাম্* অর্থাৎ পরমহংসদের জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত। তাই ব্রাহ্মণ বংশীয় বা যে কোন বংশীয় গোস্বামীই হোন, ঈর্ষাপরায়ণ হলে তাঁর 'পরমহংস' পদ থেকে পতন হবে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের দৈহিক ত্রুটি বিচার করা এক মহা অপরাধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ অপরাধকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মত্ত হস্তী সুন্দর সাজান ফুলের বাগানে ঢুকে সর্বনাশ ঘটাতে পারে। সেই রকম বৈষ্ণব অপরাধের ফলে একজনের পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হতে পারে। সেই জন্য বৈষ্ণব অপরাধ থেকে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। নিম্নাধিকারী বৈষ্ণবের উচিত উচ্চাধিকারী বৈষ্ণবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং উচ্চাধিকারী বৈষ্ণবের উচিত নিম্নাধিকারীদের শিক্ষা দান করা। বৈষ্ণব উচ্চাধিকারী বা নিম্নাধিকারী হয়

কৃষ্ণভাবনায় উন্নতির তারতম্যে। তবে জড় দৃষ্টি নিয়ে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বিচার করা উচিত নয়। বিশেষ করে কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে এই কাজ অত্যন্ত ক্ষতিকর। শুধু শুদ্ধ ভক্তের বাহ্যিক দর্শনে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর অন্তর্দর্শন করতে হবে। তিনি কিভাবে ভগবদ্ভজন করছেন তা বুঝতে হবে। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তকে দর্শন করে আমরাও ক্রমশ শুদ্ধ হতে পারি।

যারা মনে করে কৃষ্ণভাবনা শুধু বিশেষ দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তারা ভক্তের বাইরের রূপই দেখে। সেই রকম কনিষ্ঠ অধিকারীরা উত্তম ভক্তের ভগবৎ সেবার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে না পেরে মহাভাগবতকে তাদের শ্রেণীতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে। সারা বিশ্বময় কৃষ্ণকথা প্রচারের সময় আমরা এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের চারিদিকে যে সমস্ত কনিষ্ঠাধিকারী গুরুভাইয়েরা আছেন, তাঁরা বিশ্বব্যাপী হরিকথা প্রচারের অসাধারণ গুরুত্ব বুঝতে না পেরে আমাদের শুধু নিন্দা করেন ও তাঁদের শ্রেণীতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এই সব অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন অতি সরল লোকদের জন্য আমাদের দুঃখ হয়। শ্রীভগবানের কাছে শক্তি লাভ করে যিনি অন্তরঙ্গ ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত, তাঁকে সাধারণ লোক বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, 'কৃষ্ণশক্তি বিনা সারা বিশ্বে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা সম্ভব নয়।'

এইভাবে শুদ্ধ ভক্তের নিন্দা করা এক মহা বৈষ্ণব-অপরাধ এবং যিনি কৃষ্ণভাবনায় উন্নতিলাভে আগ্রহী, তাঁর পথে এই অপরাধ এক বিরাট বাধা স্বরূপ। বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধী হলে পারমার্থিক জীবনে কোন লাভ হবে না।

তাই শুদ্ধ ভক্তের প্রতি কারও ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্ দর্শন প্রাপ্ত শুদ্ধ ভক্তের ক্রিয়াকলাপের কখনও সমালোচনা করা উচিত নয়। তাঁকে

উপদেশ দেওয়া, তাঁর কাজের সংশোধন করার চেষ্টাও মহা অপরাধ। সেবাকর্মের দ্বারা উত্তম অধিকারী ও নিম্ন অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। উত্তম অধিকারী সব সময়ই গুরুপদ লাভ করেন আর কনিষ্ঠ অধিকারী তাঁর শিষ্যরূপে বিবেচিত হন। সদ্‌গুরু কখনও শিষ্য বা অন্যের উপদেশাদি নিতে বাধ্য নন। এই হচ্ছে আলোচ্য শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

শ্লোক ৭

স্যাৎকৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

শব্দার্থ

স্যাৎ—হয়; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **নাম**—পবিত্র বা দিব্য নাম; **চরিতাদি**—চরিত্র, গুণ, লীলা ইত্যাদি; **সিতা**—মিছরি; **যদি**—যদিও; **অবিদ্যা**—অবিদ্যা; **পিত্ত**—পিত্তের দ্বারা; **উপতপ্ত**—উত্তপ্ত বা উৎপীড়িত; **রসনস্য**—জিহ্বার; **ন**—না; **রোচিকা**—রুচিপ্রদ; **নু**—উপাদেয়; **কিন্তু**—কিন্তু; **আদরাৎ**—যত্ন বা আদরের সঙ্গে; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন বা প্রত্যহ; **খলু**—স্বাভাবিকভাবে; **সা**—সেই (মধুর হরিনাম); **এব**—নিশ্চিত; **জুষ্টা**—সেবন; **স্বাদ্বী**—আস্বাদিত; **ক্রমাৎ**—ক্রমে ক্রমে; **ভবতি**—রূপান্তরিত হয়; **তদ্‌গদ**—সেই রোগের; **মূল**—মূলের; **হন্ত্রী**—হননকারী।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ, লীলাদি এবং কর্মসমূহ দিব্য মধুর রসে রসান্বিত। যদি ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তির জিহ্বা অবিদ্যারূপ পাণ্ডুরোগের (Jaundice) দ্বারা আক্রান্ত থাকার ফলে সে মধুর ভগবৎ-তত্ত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না, কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যহ যদি সে পরম নিষ্ঠা বা যত্নের সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে (জিহ্বায়) এক মধুর রসের আস্বাদন লাভ করবে এবং এইভাবে তার রোগ ক্রমে ক্রমে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ লীলাদি ইত্যাদি সবই অদ্বয়-তত্ত্ব, মনোরম ও আনন্দময়। মিছরি যেমন মিষ্টি, শ্রীভগবানের পবিত্র নামও তেমনই

মধুর। অবিদ্যাকে পাণ্ডুরোগের সঙ্গে তুলনা করা হয় যা পিত্তের দূষিত রস নিঃসরণ হেতু ঘটে থাকে। পাণ্ডু রোগী মিছরির মিষ্টতা জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করতে পারে না। মিষ্টি দ্রব্য তার কাছে তিক্ত অনুভূত হয়। সেই রকম অবিদ্যায় আচ্ছন্ন মানুষের কাছে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ কীর্তন করলে অবিদ্যা রোগ দূর হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, লীলা, পরিকর ও কীর্তনের দ্বারা মাধুর্য আস্বাদন করা যায়। এইভাবে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা ভগবদ্ভক্তির পুষ্টিসাধন হবে।

কৃষ্ণভাবনা শিক্ষা ছাড়া সংসার ভোগে যে বেশি আগ্রহী, তাকেই 'ভবরোগী' বলে গণ্য করা হয়। জীবের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিত্যকাল নিয়োজিত থাকা (জীবের 'স্বরূপ' হয়-কৃষ্ণের 'নিত্যদাস')। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলেই, তার সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পতন হয়। এই মায়িক জগৎ সংসারকে 'দুরাশ্রয়', অর্থাৎ 'মিথ্যার আশ্রয়' বলা হয়। যে এই দুরাশ্রয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে নৈরাশ্যের মধ্যে আশাবাদী। মায়িক জগতে সকলেই সুখ অন্বেষণ করছে, কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে জীব নিজের ভুল-ত্রুটি বুঝতে পারে না। একটি ভুল সংশোধন করতে গিয়ে সে আর একটি ভুল করে। এইভাবে সে মায়ার সংসারে জীবন-যুদ্ধ করে চলেছে। এই রকম মায়া-কবলিত বদ্ধদশায় তাকে যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সুখী হতে বলা হয়, তা হলে সেই উপদেশ সে কখনও গ্রহণ করে না।

এই 'অবিদ্যা রোগ' থেকে জীবকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনার অমৃত-বারি বর্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমান জগতের অবিদ্যাচ্ছন্ন রাষ্ট্রনায়ক ও নেতারা জনসাধারণকে বিভ্রান্তির পথে চালিত করছে। রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী যেই বলুন না কেন, সকলেই বিভ্রান্ত। কারণ তারা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ নন। ভগবদ্‌গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই কৃষ্ণভাবনা শূন্য ভগবৎ

সেবাহীন দুষ্কৃতকারী, মূর্খ, নরাধম, যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে, যারা নাস্তিক আসুরিক জীবন যাপন করে, তারা কখনও শ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি করে না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"সেই সব দুর্বৃত্তগণ যারা মূঢ়, নরাধম, যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা আমার নিকট প্রপত্তি করে না।"

(ভঃ গীঃ ৭/১৫)

তারা শ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি করে না, এবং যারা তাঁর শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করার চেষ্টা করে, তাদের তারা বাধা দেয়। এই সব অসুরেরাই দেশের নেতা হওয়ার ফলে সমগ্র দেশই অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। পাণ্ডু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন মিছরির মিষ্টতা আস্বাদন করতে পারে না, ঠিক তেমনই দেশের এই রকম অবস্থায় কেউই কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করতে উৎসাহী হয় না। তথাপি সকলের জানা উচিত পাণ্ডুরোগ থেকে মুক্তির একমাত্র ঔষধ হচ্ছে মিছরি। সেই রকম বিভ্রান্ত, বিপদগামী, উদ্দেশ্যহীন মানব জাতির সম্মুখে কৃষ্ণভাবনামৃতই একমাত্র পথ এবং মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জগৎ-বাসীর মুক্তির একমাত্র উপায়। ভগরোগগ্রস্ত জীবের পক্ষে কৃষ্ণভাবনার উপদেশ সুখ কর না হতে পারে, কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপদেশ হচ্ছে, কেউ যদি একান্তই ভবরোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণানুশীলন করতেই হবে এবং তা পরম নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে। এই যুগে ভবরোগের মহৌষধ হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' এবং এই মহামন্ত্র কীর্তন দ্বারা ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হবে, মানুষের চিত্তদর্পণ নির্মল হবে

(চেতোদর্পণমার্জনম্)। অবিদ্যা তথা স্বরূপ- বিভ্রমই আমাদের হৃদয়ে জড় অহঙ্কার সৃষ্টির মূল কারণ।

আসলে আমাদের চিত্তই মলিন। সেই চিত্ত নির্মল হলে আমরা কৃষ্ণভাবনাময় হব, তখন আমাদের চিত্ত ভবরোগ দ্বারা আর আক্রান্ত হবে না। চিত্ত নির্মল করতে, আবিদ্যার অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা। পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন মাত্র ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়, সমস্ত সংসার দুঃখের অবসান হয়।

হরিকথা কীর্তনে তিনটি স্তর বা সোপান আছে। যথা—নামাপরাধ, নামাভাস আর শুদ্ধ নাম। কনিষ্ঠ অধিকারীর হরিনাম কীর্তন সাধারণত নামাপরাধ। নামাপরাধ দশটি, এই দশটি অপরাধ ত্যাগ করে নামাপরাধ ও শুদ্ধ নামের মধ্যবর্তী অবস্থা প্রাপ্তিকে নামাভাস বলা হয়। আর যিনি শুদ্ধভাবে হরিনাম কীর্তন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন, এই অবস্থাকেই 'ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্' বলে। এই ভাবে সংসার জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই অমৃতময় দিব্য জীবনের স্বাদ আস্বাদন করা যায়।

সিদ্ধান্ত এই যে, ভবরোগ মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা। কৃষ্ণভাবানামৃত সংঘের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করা। কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলকে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করা। প্রথমে হরিনাম কীর্তন করতে হবে। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস যখন কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে, তখন সংঘের সভ্য হওয়া যায়। সারা বিশ্বে আমরা সংকীর্তন দল প্রেরণ করছি, এমন কি সব চেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে কেউ কোন দিন কৃষ্ণনাম শোনেনি, সেখানেও হাজার হাজার লোক আমাদের সংকীর্তন দলে যোগ দিয়ে পবিত্র 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করছে। কোন কোন স্থানে জনসাধারণ মাত্র কয়েকদিন কৃষ্ণ-কীর্তন শুনেই ভক্তদের অনুকরণ করতে শুরু করে, তারাও মস্তক মুণ্ডন করে, কৃষ্ণকীর্তন করে। এটা অনুকরণ হলেও কৃষ্ণসেবানুকরণ বাঞ্ছনীয়। অনুকরণকারীরা ক্রমশ একদিন দীক্ষা গ্রহণে আগ্রহান্বিত হয় ও সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষার জন্য আত্মসমর্পণ করে।

যে ব্যক্তি সৎ ও নিষ্কপট, সেই ব্যক্তিকে দীক্ষা দেওয়া হয়। তারপর সে ভগবৎ সেবা শুরু করে, এই অবস্থাকে ভজন ক্রিয়া বলে। তখন প্রতিদিন সে পঁচিশ হাজার পবিত্র হরিনাম জপ করে এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ আমিষ আহার, নেশা, জুয়া খেলা ইত্যাদি থেকে সে বিরত থাকে। এইভাবে ভজন ক্রিয়ায় সংসার মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে হোটেল রেস্তোরাঁর তথাকথিত উপাদেয় মুখরোচক মাছ-মাংস আর পেঁয়াজ, রসুনে তৈরি খাবারে সে আকৃষ্ট হয় না; চা, কফি, পান, বিড়ি সিগারেটেও তার রুচি হয় না। শুধু অবৈধ স্ত্রী সঙ্গই সে ত্যাগ করে না, স্ত্রী সঙ্গই সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। জুয়াখেলা, ফাটকাবাজিতেও সে সময় নষ্ট করে না, আগ্রহও দেখায় না। এইভাবে সে অনর্থ থেকে মুক্ত হচ্ছে মনে করা যায়। একে বলে 'অনর্থ-নিবৃত্তি'। কৃষ্ণভাবনায় আসক্ত হলেই 'অনর্থ-নিবৃত্তি' হয়।

অনর্থ-নিবৃত্তি হলে কৃষ্ণ-ভজনে নিষ্ঠা হয়। বাস্তবিক সকল কৃষ্ণ কর্মের প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে, এবং তখন কৃষ্ণ-ভজন করতে করতে সে 'ভাব'-এ আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এই 'ভাব-উদয়' কৃষ্ণপ্রেমেরই প্রাথমিক অবস্থা। এইরূপে বদ্ধ জীব সংসার মুক্ত হয়ে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সে জড় ঐশ্বর্য জড় বিদ্যা, সব রকম জড় আকর্ষণে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় সে শ্রীভগবানকে অনুভব করে ও তার শক্তি মায়াকে বুঝতে পারে।

যিনি 'ভাব'-এর অবস্থা লাভ করেছেন, মায়া বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আর বিচলিত করতে পারে না, তাঁর মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। কারণ ভক্ত তখন মায়ার স্বরূপ বুঝতে পারে। মায়া মানেই শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি, আর কৃষ্ণভাবনা ও কৃষ্ণ-বিস্মৃতি আলো-আঁধার এর মতো পাশাপাশিই থাকে। যদি কেউ আঁধারে থাকে, সে আলোক উপভোগ করতে পারে না; কিন্তু যে আলোকে থাকে, অন্ধকার তাকে বিচলিত করতে পারে না। তাই যে কৃষ্ণানুশীলন করবে, সে

ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে যাবে এবং কৃষ্ণলোকে বাস করবে, বাস্তবিক মায়ান্ধকার তাকে স্পর্শও করতে পারবে না। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (মধ্য ২২/৩১) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন–

কৃষ্ণ–সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥

সুতরাং সূর্যসম কৃষ্ণকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা মাত্রই মায়ার অন্ধকার তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

শ্লোক ৮

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলামিত্যুপদেশ-সারম্ ॥ ৮ ॥

শব্দার্থ

তৎ—তাঁর (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের); **নাম**—পবিত্র নাম; **রূপ**—আকৃতি; **চরিতাদি**—চরিত্র, গুণ, লীলা ইত্যাদি; **সুকীর্তন**—উত্তম কীর্তন; **অনুস্মৃত্যোঃ**—অনুক্ষণ স্মরণ; **ক্রমেণ**—ক্রমে ক্রমে; **রসনা**—জিহ্বা; **মনসী**—মন; **নিযোজ্য**—নিয়োজিত; **তিষ্ঠন্**—তিষ্ঠ বা স্থিত হওয়া; **ব্রজে**—ব্রজধামে; **তৎ**—তাকে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে); **অনুরাগি**—অনুরাগ; **জন**—ব্যক্তি; **অনুগামী**—অনুগামী; **কালম্**—কাল; **নয়েৎ**—ব্যবহার করা উচিত; **অখিলম্**—সমগ্র; **ইতি**—এইভাবে; **উপদেশ**—উপদেশের; **সারম্**—সারাংশ।

অনুবাদ

সমগ্র উপদেশ সমূহের সারাংশ হল এই যে, প্রত্যেকের শ্রীভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি উত্তমরূপে নিরন্তর কীর্তন ও স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এই উপায়ে মন ও জিহ্বা ক্রমে ক্রমে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হবে। এইভাবে ব্রজধামে (গোলোক বৃন্দাবন ধাম) বাসপূর্বক কৃষ্ণভক্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত, এবং ভগবানের ভক্তি সেবায় নিমগ্ন তাঁর প্রিয় ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত।

তাৎপর্য

মনই আমাদের শত্রু, আবার মনই আমাদের বন্ধু। কিন্তু সেই মনকে শিক্ষা দিয়ে সব সময়ের জন্য বন্ধুতে পরিণত করতে হবে। মানুষের মনকে শিক্ষা দিয়ে

কৃষ্ণভাবনাময় করে তোলাই কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য। শুধু এই জীবনের অভিজ্ঞতা বা ভাবই নয়, বিগত শত সহস্র জীবনের অভিজ্ঞতা, ভাব ইত্যাদি আমাদের মনে বর্তমান থাকে। এই সমস্ত ভাবগুলি কখনও কখনও একত্রিত হলে মনোজগতে পরস্পর বিরোধী ভাবের উদয় হয়। এইভাবে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মানসিক ক্রিয়া কখনও কখনও বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তাই মনোবিজ্ঞানীরাও মনের এই ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সচেতন। *ভগবদ্গীতায়* (৮/৬) বর্ণিত আছে–

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময়ে দেহত্যাগের পূর্বে জীব যা চিন্তা করে, দেহত্যাগের পরে সেই অবস্থা সে প্রাপ্ত হয়।"

দেহত্যাগের সময় জড় মন ও বুদ্ধি পরবর্তী জীবনের জন্য সূক্ষ্ম দেহ গঠন করে। সেই সময় যদি হঠাৎ ভগবৎ প্রতিকূল চিন্তা করে, তা হলে জীবাত্মা তদনুরূপ পুনর্জন্ম লাভ করে। পক্ষান্তরে মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলে, ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে গতি লাভ হয়। এই রকম দেহান্তর ব্যবস্থা খুব সূক্ষ্মভাবে ঘটে। তাই এখানে শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ ভক্তদের মনকে সেই রকমভাবে গঠন করতে উপদেশ দিচ্ছেন যাতে মৃত্যুর সময় মন যেন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা না করে। সেই রকম জিহ্বাকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে জিহ্বা কৃষ্ণ-প্রসাদ ছাড়া যেন অন্য কিছু আহার না করে, কৃষ্ণ-কথা ছাড়া কৃষ্ণেতর কথা না বলে। তিনি আরও উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে তিষ্ঠন্ ব্রজে– অর্থাৎ ব্রজে বাস করবে।

ব্রজভূমি, অর্থাৎ বৃন্দাবন চুরাশি ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত। বৃন্দাবনে বসবাসকালে সেখানে শুদ্ধভক্তের শরণ নিতে হবে। এইভাবে সব সময় শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর

অপ্রাকৃত লীলা স্মরণ করতে হবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১/২/২৯৪)* এই বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনং চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

ভক্তের সর্বদা ব্রজভূমিতে বাস করা উচিত এবং সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পার্ষদদের কথা স্মরণ করা উচিত। তাঁর পার্ষদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাদের নিত্য তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভজন করতে করতে কৃষ্ণ সেবায় তীব্র অভিলাষ জাগ্রত হবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১/২/২৯৫)* আরও লিখেছেন—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

ব্রজভূমিতে বিশেষ কোন কৃষ্ণ-পার্ষদের আনুগত্যে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবাসীদের ভাব নিয়ে শ্রীভগবানের সেবা করতে হবে। এই পথ সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য এবং সিদ্ধ অবস্থায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ মায়াবদ্ধ অবস্থায়ও এইভাবে কৃষ্ণানুশীলন করা যায়; আবার মুক্ত অবস্থায় ভগবৎ প্রাপ্তির পরও সিদ্ধ পুরুষেরা এইভাবে ভগবদ্ভজন করতে পারেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, "যার চিত্তে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়নি, তার উচিত সব রকম জড় অভিলাষ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, লীলা, পরিকরাদি স্মরণ ও কীর্তন করা এবং ঐভাবে বৈধীভক্তির অনুশীলন করে মনকে শিক্ষিত করা। এইরূপে কৃষ্ণতত্ত্বে রুচির উন্মেষ হলে বৃন্দাবনে বাস করা উচিত এবং একজন নিপুন ভক্তের অধীনে সব সময় কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণযশ, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণগুণাদি স্মরণ করে কালাতিপাত করা উচিত। ভগবৎ-সেবা অনুশীলনের এই হচ্ছে সারকথা।"

প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তের সব সময় কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা উচিত। এই অবস্থার নাম 'শ্রবণ দশা'। অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য শুনতে শুনতে যে অবস্থা লাভ হয়, তার নাম 'বরণ-দশা' অর্থাৎ এই অবস্থায় ভক্ত কৃষ্ণ-কথা গ্রহণ করার মত মানসিক অবস্থা লাভ করেন। যার 'বরণ-দশা' প্রাপ্তি হয়েছে, কৃষ্ণ-কথায় তার আসক্তি হয়েছে আর যিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কীর্তন করেন, তিনি 'স্মরণাবস্থা' লাভ করেছেন। কৃষ্ণ স্মরণের পাঁচটি পর্যায়ক্রম অবস্থা হচ্ছে—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি। প্রাথমিক অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ মাঝে মাঝে ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু পরে তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ অব্যাহত হলে, তা ঘনীভূত হয়ে 'শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান' হবে। শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান অবিরাম অব্যাহত ভাবে চললে তাকে 'অনুস্মৃতি' বলে। অবিরাম ও অব্যাহত অনুস্মৃতির ফল 'সমাধি'। স্মরণ-দশার এই চরম অবস্থায় বা পূর্ণ সমাধিতে জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, জীব তার নিত্য কৃষ্ণদাসত্ব পূর্ণ ও নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করে। এই অবস্থার নাম 'সম্পত্তি-দশা', অর্থাৎ জীবনে পরম সিদ্ধি বা পূর্ণতা লাভ করা।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, কনিষ্ঠ অধিকারী কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য সব অভিলাষ ত্যাগ করে কেবল শাস্ত্রানুগ বৈধী ভক্তি অনুশীলন করবেন। ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে তাঁর আসক্তির উদয় হবে। এই রকম আসক্তি হলে, তখন বৈধী ভক্তি পালন না করে স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণপদ্মে সেবা করলেই হবে। এই অবস্থাকে 'রাগানুগ ভক্তি' বলে। তখন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ কোন ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে ভগবৎ সেবা করে তাকে 'রাগানুগ ভক্তি' বলে। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গো-বৎস, তাঁর হাতের লাঠি, বাঁশি বা গলার মালারূপে শান্তরসে রাগানুগ-ভক্তি সাধন করা যায়। দাস্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের দাস, চিত্রক, পত্রক বা রক্তকের পদাঙ্ক

অনুসরণীয়। সখ্য-রসে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলদেব, শ্রীদাম, সুদামের মতো শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করা উচিত। বাৎসল্য রসে নন্দ মহারাজ, যশোদাদির মতো আর মাধুর্য রসে (যুগলপ্রীতি) শ্রীমতী রাধারাণী, তাঁর সখী ললিতাদি বা তাঁর মঞ্জরী, রূপ ও রতির মতো ভগবদ্ভজন করা উচিত। ভক্তিযোগ বিষয়ে *শ্রীউপদেশামৃতের* এই হচ্ছে সারাংশ।

শ্লোক ৯

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥ ৯ ॥

শব্দার্থ

বৈকুণ্ঠাৎ—ঐশ্বর্যময় দিব্য জগৎ বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা; **জনিতঃ**—(ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) আবির্ভাবের জন্য; **বরা**—শ্রেষ্ঠা; **মধুপুরী**—মথুরা মণ্ডল অর্থাৎ মথুরা; **তত্রাপি**—তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; **রাস-উৎসবাৎ**—রাস-লীলা উৎসবের জন্য; *বৃন্দা-অরণ্যম্*—বৃন্দাবনের অরণ্য; *উদার-পাণি*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **রমনাৎ**—নানাবিধ প্রেমময় লীলা-বিলাসের জন্য; **তত্রাপি**—তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; **গোবর্ধনঃ**—গোবর্ধন; **রাধাকুণ্ডম্**—রাধাকুণ্ড নামক পুণ্য স্থান; **ইহাপি**—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; গোকুল পতেঃ—গোকুলরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; *প্রেমামৃত*—দিব্য প্রেমরূপ অমৃতের দ্বারা; **আপ্লাবনাৎ**—প্লাবন হওয়ার জন্য; **কুর্যাৎ**—করতেন; অস্য—এর (রাধাকুণ্ডের) **বিরাজতঃ**—বিরাজমান; **গিরিতটে**—গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে; **সেবাম্**— সেবা; **বিবেকী**—বিবেক-সম্পন্ন (ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত) ব্যক্তি; **ন**—নয়; **কঃ**—কে।

অনুবাদ

মথুরা নামক দিব্য স্থান ঐশ্বর্যময় অপ্রাকৃত জগৎ বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীভগবান স্বয়ং সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার বৃন্দাবনের অরণ্য মথুরা মণ্ডল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে রাসলীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং গোবর্ধন পর্বত বৃন্দাবন-অরণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তা শ্রীভগবানের চিন্ময় হস্তের দ্বারা উত্তোলিত হয়েছিল এবং সেখানে ভগবান নানাবিধ প্রেমময় লীলা-বিলাস সাধন করেছিলেন

এবং এই সবের ঊর্ধ্বে পরম রমণীয় রাধাকুণ্ড হল সর্বোত্তম স্থান, তার কারণ তা গোকুলরাজ শ্রীকৃষ্ণের অমৃতোপম প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সুতরাং এমন কোন বিবেকী ব্যক্তি কি কোথাও আছেন যিনি গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এমন পরম রমণীয় রাধাকুণ্ডের সেবা করতে অভিলাষী নন?

তাৎপর্য

সৃষ্টির তিন-চতুর্থাংশই হল অপ্রাকৃত জগৎ অর্থাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত বা পরম ধাম। স্বভাবতই তা জড় জগৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রাকৃত জগতে মথুরা ও তদসন্নিহিত অঞ্চল অপ্রাকৃত জগতের বৈকুণ্ঠধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। কারণ এই মথুরায় স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার বৃন্দাবনের অরণ্যসমূহ (দ্বাদশ বন) অর্থাৎ তালবন, মধুবন, বহুলাবন ইত্যাদি মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ভগবান তথায় তাঁর নানাবিধ লীলাদি বিলাস করেছিলেন। কিন্তু গিরিগোবর্ধন, বৃন্দাবন-অরণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর করকমলে গোবর্ধনকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করে ব্রজবাসীদের ইন্দ্রের ক্রোধ ও প্রবল বর্ষণ থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং এইখানেই শ্রীভগবান তাঁর সখা রাখাল বালকদের নিয়ে গো-বৎস চারণ করতেন ও প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধারাণীর সাথে মিলিত হতেন। গোবর্ধন গিরির পাদদেশে পরম রমণীয় রাধাকুণ্ডেই উত্তম ভক্তগণ বসবাস করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম ব্রজভূমি দর্শন কালে মহাপ্রভু রাধাকুণ্ডের সন্ধান পাননি। এর অর্থ এই যে, তখন তিনি সঠিকভাবে রাধাকুণ্ডের অবস্থান অন্বেষণ করেছিলেন। অবশেষে তিনি সেই পবিত্র স্থানের সন্ধান পান; তখন সেখানে একটি ছোট্ট পুষ্করিণী ছিল। তিনি সেই পুষ্করিণীতে স্নান করেন, এবং ভক্তদের বলেন যে, ঐ স্থানে রাধাকুণ্ড অবস্থিত। পরে ষড়-গোস্বামীদের মধ্যে বিশেষত শ্রীরূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নেতৃত্বে পুষ্করিণীটি আরও খনন করা হয়।

আজও সেখানে সেই বৃহৎ শ্রীরাধাকুণ্ড বর্তমান। স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই রাধাকুণ্ড আবিষ্কার অভিলাষ করায় শ্রীরূপ গোস্বামী স্থানটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; তাই রাধাকুণ্ডই জগতের সর্বোত্তম ভজনস্থল। ভজনচতুর ভক্তমাত্রেই রাধাকুণ্ডে বাস করবেন। কিন্তু যারা গৌরভক্ত নন, যারা অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব তারা এই স্থানের পারমার্থিক গুরুত্ব ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন না। কেবল মহাপ্রভুর অনুগত গৌর-ভক্তগণই এই মহিমা অনুভব করে রাধাকুণ্ডের সেবা করেন।

শ্লোক ১০

কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥ ১০॥

শব্দার্থ

কর্মিভ্যঃ—সর্ব প্রকার সৎকর্ম নিরত পূণ্যবান কর্মীর তুলনায়; **পরিতঃ**—সর্বতোভাবে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **প্রিয়তয়া**—প্রিয় হওয়ার জন্য; **ব্যক্তিং যযুঃ**—শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; **জ্ঞানিন**—জ্ঞানশালী ব্যক্তিগণ; **তেভ্যঃ**—অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ; **জ্ঞানবিমুখ**—জ্ঞান হতে মুক্ত; **ভক্তি-পরমাঃ**—যাঁরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত; **প্রেমৈক-নিষ্ঠাঃ**—যারা ভগবৎ-প্রেম লাভ করেছেন; **ততঃ**—তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ; **তেভ্যঃ**—অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ; **তাঃ**—তারা; **পশুপালপঙ্কজদৃশঃ**—কৃষ্ণগতপ্রাণা সেই ব্রজ-নারীগণ; **তাভ্যঃ**—তাঁদের সকলের ঊর্ধ্বে; **অপি**—নিশ্চিত; **সা**—তিনি; **রাধিকা**—শ্রীমতী রাধারাণী; **প্রেষ্ঠা**—অতি প্রিয়; **তদ্বৎ**—সেইরূপ; **ইয়ম্**—এই; **তদীয়-সরসী**—তাঁর সরোবর (রাধাকুণ্ড); **তাম্**—রাধাকুণ্ড; **ন**—না; **আশ্রয়েৎ**—আশ্রয় গ্রহণ করেন; **কঃ**—কে; **কৃতী**—পরম সৌভাগ্যবান।

অনুবাদ

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, সকল প্রকার সৎকর্মনিরত পুণ্যবান কর্মীর তুলনায় চিদান্বেষী জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীহরির প্রিয়। ঐ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যাঁরা তাঁদের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির স্তর লাভ করেছেন, তাঁরা ভগবানের ভক্তি-সেবা লাভ করতে পারেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং যিনি প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন তিনি ঐ মুক্তি প্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু

ব্রজনারীগণ (গোপীগণ) ভক্তির অনন্য স্তরে অধিষ্ঠিতা, কারণ তাঁরা কৃষ্ণগতপ্রাণা। ঐ ব্রজনারীগণের বা গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। গোপীদের মধ্যে প্রিয়তম এই গোপীটির মতো (শ্রীমতী রাধারাণীর মতো) তাঁর কুণ্ডও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিগূঢ়ভাবে প্রিয়। সুতরাং এমন কে আছেন যিনি রাধাকুণ্ডের এমন অপ্রাকৃত ভাবময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে রাধাগোবিন্দের 'অষ্টকালীয়' ভজন না করবেন? বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা রাধাকুণ্ডের তীরে রাধাকৃষ্ণের ভজন-সাধন করেন, তাঁরা পরম সৌভাগ্যবান।

তাৎপর্য

বর্তমান যুগে জগতের প্রায় সকলেই সকাম কর্মী; কারণ তাদের সকলেই কর্মফল ভোগ করতে চায়। এইভাবে আমরা দেখি যে, এই জড় জগতের প্রতিটি জীবই মায়ার দ্বারা আবদ্ধ। এই কথা *বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১)* বর্ণনা করা হয়েছে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

সাধুগণ ভগবৎ শক্তিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। যথা—পরা শক্তি, তটস্থা শক্তি ও অপরা জড়া শক্তি। আবার এই জড়া শক্তিকে তৃতীয় শক্তি বলেও গণ্য করা হয়। জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত জীবেরা শুধু ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কুকুর ও শূকরের মতো কঠোর পরিশ্রম করে। এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে পূণ্যকর্মের ফলে কোন কোন কর্মী বেদের কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে (ধর্মানুষ্ঠানে) বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে তারা উর্ধ্বগতি লাভ করে স্বর্গলোকে গমন করে। যারা নিখুঁতভাবে বৈদিক প্রথানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তারা চন্দ্রলোকে বা আরও উর্ধ্বলোকে গমন করে। *ভগবদ্গীতায় (৯/২১)* এ

বিষয়ে উল্লেখ আছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি*– পুণ্যের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হলে কর্মীরা আবার জন্ম-মৃত্যুলোকে বা পৃথিবীতে ফিরে আসে। যারা পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোক লাভ করে, তারা সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে সুখ ভোগ করে, কিন্তু পুণ্যের ফল ক্ষয় হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তাদের জন্ম-মৃত্যুময় এই জগতে ফিরে আসতে হয়।

এই হচ্ছে কর্মী অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠের অবস্থা। পুণ্যবান হোক, আর পাপীই হোক, প্রত্যেকের একই অবস্থা। এই জগতের ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য প্রায় সকলেই জড় সুখে আসক্ত। সৎ বা অসৎ যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এদের কর্মী বা ঘোর জড়বাদী বলা হয়। এই কর্মীদের মধ্যে অনেক বিকর্মীও আছে, যারা বেদবিরোধী কর্ম করে। কিন্তু যাঁরা বেদনিষ্ঠ, তাঁরা বিষ্ণুর প্রীতির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ও শ্রীভগবানের আশীর্বাণী লাভ করেন। এইভাবে তারা ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন। কিন্তু কর্মীরা বিকর্মী অপেক্ষা শ্রেয়। যেহেতু তারা বেদনিষ্ঠ, তাই ভগবান তাদের প্রতি তুষ্ট হন। *ভগবদগীতায় (৪/১১)* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

অর্থাৎ "যে যেভাবে আমার কাছে প্রপত্তি করে, তাকে সেইভাবে কৃপা করি।' শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কৃপাসিন্ধু, তাই শুধু ভক্তকেই তিনি কৃপা করেন না, কর্মী ও জ্ঞানীর অভিলাষও তিনি পূর্ণ করেন। কর্মীরা ঊর্ধ্বগতি লাভ করে, কিন্তু যতদিন তারা কর্মফলে আসক্ত ততদিন জন্মমৃত্যুর আবর্তে তারা জড়দেহ ধারণ করবে। কেউ যদি পুণ্যকর্ম করে, তা হলে তার ফলে সে নতুন দেহ লাভ করে দেবতাদের মধ্যে ঊর্ধ্বলোকে বসবাস করবে বা আরও ঊর্ধ্বগতি লাভ করে সে আরও অধিক জড়সুখ ভোগ করবে। আর পাপকর্মের ফলে তার অধোগতি লাভ হবে, পশু বা গাছপালা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। সুতরাং যারা বিকর্মী, যারা

বেদবিমুখ, সাধুরা তাদের প্রশংসা করেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪) উল্লেখ আছে–

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ॥

"ইন্দ্রিয়ভোগ পরায়ণতার জন্য যারা কুকুর ও শূকরের মতো কঠোর পরিশ্রম করে, সেই জড়বাদীরা সবাই উন্মত্ত; শুধু ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য তারা সব রকম জঘন্য কাজ করতে পারে। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা এই সব জড় কর্মে লিপ্ত হয় না, কারণ তার ফলে তাদের দুঃখময় জড় দেহ লাভ করতে হয়। মায়িক দশায় ত্রিতাপ ক্লেশ আনুষঙ্গিকভাবে থাকে; এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়াই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত, জড় কর্মীরা অর্থোপার্জনের জন্য এবং অস্থায়ী জড় সুখের জন্য উন্মত্ত; এই জন্য তারা নিম্নযোনি সম্ভূত জীবন লাভ করার ঝুঁকি গ্রহণ করে। মূর্খ বিষয়ীরা ভৌতিক জগতে ভোগ সুখের জন্য কত পরিকল্পনা করে। অথচ তারা একবারও ভেবে দেখে না সীমাবদ্ধ জীবনকালের মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য অর্থোপার্জনেই তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়ে যায়। এইভাবে একদিন তাদের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুতে তাদের জড় কর্মের অবসান হয়। পরবর্তী জীবনে পশু, গাছপালায় দেহান্তরিত হওয়ার কথা তারা কখনও বিবেচনা করে না এবং এইভাবে তাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। জন্ম থেকেই তারা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। শুধু তাই নয়, অজ্ঞানে আবদ্ধ হয়ে আকাশস্পর্শী অট্টালিকা, বিরাট গাড়ি, সম্মানীয় পদ ইত্যাদি জড় উপকরণকে ভোগ বলে মনে করে। তারা জানে না যে, পরবর্তী জীবনে তাদের অধোগতি হবে, তাদের ভোগের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হবে, তারা জীবনে 'পরাভব' অর্থাৎ ব্যর্থতা লাভ করবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) তার উল্লেখ আছে–

পরাভবস্তাবদবোধজাতঃ।

তাই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য উৎসুক হতে হবে। "আমি দেহ নই, আমি আত্মা,ঃ এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞানতার অন্ধকারেই জীবন নষ্ট

হবে। লক্ষ লক্ষ লোক ইন্দ্রিয় ভোগেই জীবন অতিবাহিত করছে, কিন্তু তাদের মধ্যে হয়ত একজন আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হয়। সে বোঝে জীবনের একটা অর্থ আছে; এই রকম ব্যক্তিকেই জ্ঞানী বলে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন এইরূপ কর্মই জীবকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দেহান্তর ঘটায়। শ্রীমদ্ভাগবতে 'শরীরবন্ধ' শব্দটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে—"যতদিন ভোগ বাসনা থাকবে, ততদিন কর্মফলে আসক্তি থাকবে, এবং তার ফলে অন্য দেহ গ্রহণ করতে হবে।"

এই জন্য কর্মীর চেয়ে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি অন্তত অন্ধ ভোগবাসনা থেকে বিরত থাকেন। শ্রীভগবানও শাস্ত্রে সেই কথা বলেছেন। যাই হোক, কর্মী অজ্ঞানাচ্ছন্ন আর জ্ঞানী তা থেকে মুক্ত হলেও, জ্ঞানী যদি ভগবদ্ভজন না করেন, তা হলে তাকে অবিদ্যাগ্রস্ত বলেই বিবেচনা করা হয়। যত বড় জ্ঞানীই হোন না কেন, তাঁর যদি ভগবৎ চরণে ভক্তি না থাকে, তিনি যদি ভগবৎ সেবা উপেক্ষা করেন, তাহলে তাঁর বুদ্ধিকে অবিশুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়।

জ্ঞানী যখন ভগবদ্ভজন করেন, তখন তিনি সাধারণ জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেয়। তখন তাঁর সেই উন্নত অবস্থাকে বলা হয় জ্ঞান *বিমুক্ত-ভক্তিপরম্।* জ্ঞানী কিভাবে ভগবদ্ভজন শুরু করেন সেই বিষয়ে *ভগবদগীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর যথার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে সকল কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার চরণে প্রপত্তি করে। এই রকম মহাত্মা সত্যই জগতে দুর্লভ।" প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী যিনি ভগবানের পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করেন। কিন্তু এমন মহাত্মা অতি বিরল।

বৈধীভক্তি অনুশীলন করে নারদ মুনি, সনক, সনাতনাদির পদাঙ্ক অনুসরণে রাগানুগা-ভক্তির উদয় হয়। তখন শ্রীভগবান তাকে একজন মহত্তর ভক্ত হিসাবে গণ্য করেন। যাঁদের হৃদয়ে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়েছে, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

ব্রজের গোপীগণ শ্রীভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত কারণ শ্রীভগবানকে তুষ্ট করা ছাড়া তাঁদের জীবনের অন্য কোন লক্ষ্যই নেই। ভগবৎ সেবার বিনিময়ে গোপীগণ শ্রীভগবানের কাছে কিছু প্রত্যাশাও করেন না। এমন কি, শ্রীভগবান যদি কখনো তাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে তাঁদের চরম দুঃখেও নিপতিত করেন, তথাপি তাঁরা শ্রীভগবানকে ভোলেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা যাত্রা করলে গোপীগণ দুঃখে কাতর হয়ে সারা জীবন কৃষ্ণবিরহেই অতিবাহিত করেন। সুতরাং এক অর্থে তাঁরা কোনদিনই কৃষ্ণসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হননি, কারণ কৃষ্ণচিন্তা করা বা কৃষ্ণ-স্মরণ করা আর কৃষ্ণসঙ্গ করার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। বরং এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো *'বিপ্রলম্ভ সেবা'* অর্থাৎ বিরহে কৃষ্ণ চিন্তা প্রত্যক্ষ কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। তাই অনন্য কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে গোপীগণই সর্বোত্তমা, আবার সকল গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী প্রধানতমা। শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণভক্তি অদ্বিতীয়। এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত রাধারাণীর ভক্তিভাব উপলব্ধি করতে অসমর্থ ছিলেন। তাই রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন।

এইভাবে শ্রীরূপ গোস্বামী অবশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শ্রীমতী রাধারাণীই সর্বোত্তমা কৃষ্ণভক্ত এবং তাঁর সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ডই সর্বোত্তম স্থান। এই সিদ্ধান্তের সত্যতা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* উল্লেখ অনুসারে *লঘুভাগবতামৃতের* (উত্তর খণ্ডে ৪৫) প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (বিষ্ণুর) সবচেয়ে প্রিয় শ্রীমতী রাধারাণী, তাই রাধারাণীর স্নান-সরোবর রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় স্থান। সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের উচ্চতম হৃদয়মণি।"

তাই কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ ভক্তমাত্রেরই একান্তে রাধাকুণ্ডে আশ্রয় নিয়ে সারাজীবন ভগবৎ সেবা করা উচিত। *শ্রীউপদেশামৃতের* দশম শ্লোকে এই হল রূপ গোস্বামীর প্রধান উপদেশ।

শ্লোক ১১

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

শব্দার্থ

কৃষ্ণস্য—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **উচ্চৈঃ**—সুউচ্চ; **প্রণয়-বসতিঃ**—প্রেমের বস্তু; **প্রেয়সীভ্যঃ**—প্রেমময়ী গোপীগণের মধ্যে; **অপি**—নিশ্চিত; **রাধা**—শ্রীমতী রাধারাণী; **কুণ্ডম্**—সরোবর; **চ**—ও; **অস্যাঃ**—তাঁর; **মুনিভিঃ**—মহান মুনিগণের দ্বারা; **অভিতঃ**—সর্বতোভাবে; **তাদৃক্-এব**—সেইরূপ; **ব্যধায়ি**—বর্ণিত; **যৎ**—যা; **প্রেষ্ঠৈঃ**—অনন্য ভক্তগণের দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **অলম্**—পর্যাপ্ত; **অসুলভম্**—দুর্লভ; **কিম্**—কি; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভক্তি-ভাজাম্**—ভক্তি সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য; **তৎ**—তা; **প্রেম**—ভগবৎ প্রেম; **ইদম্**—এই; **সকৃৎ**—একবার মাত্র; **অপি**—এমন কি; **সর**—সরোবর; **স্নাতুঃ**—যে ব্যক্তি স্নান করেছেন; **আবিষ্করোতি**—উদিত বা জাগরিত হয়।

অনুবাদ

শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভূমির প্রেমময়ী গোপবালিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তাঁর সরোবরও তাঁরই মতো শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। শাস্ত্রে মুনিগণ এইরূপে বর্ণনা করেছেন। এমন কি এই রাধাকুণ্ড মহান্ মুনিগণেরও দুর্লভ বস্তু। সুতরাং সাধারণ ভক্তের নিকট তা প্রকৃতই দুর্লভ। সুতরাং কেউ যদি সেই পবিত্র সরোবরে একবার অবগাহন করেন, তা হলে তাঁর অন্তরে ভগবৎ প্রেমের উদয় হবে।

তাৎপর্য

শ্রীরাধাকুণ্ড জগতের সর্বোত্তম স্থান কেন? কারণ এই সরোবর শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তমা ভক্ত শ্রীমতী রাধারাণীর 'জলকেলি'র স্থান। সকল গোপীদের মধ্যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা; তাই রাধারাণীর সরোবর রাধাকুণ্ড, রাধারাণীর

মতোই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম স্থান। বাস্তবিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডকে রাধারাণীর মতোই ভালবাসেন। শুধু বৈধীভক্তি অনুশীলনকারীই নয়, এমনকি নিবিষ্টভাবে ভগবদ্ভজনকারী মহাত্মারাও সহজে রাধাকুণ্ড লাভ করতে পারেন না। তাই রাধাকুণ্ড সত্যই দুর্লভ।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, একবার মাত্র রাধাকুণ্ডে স্নান করলে নাকি ভক্তের গোপীভাবের উদয় হয়; তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতে কেউ যদি রাধাকুণ্ডতটে স্থায়ীভাবে বসবাস না-ও করতে পারে, তথাপি ভক্তমাত্রেই যতবার সম্ভব রাধাকুণ্ডে স্নান করা উচিত। ভগবদ্ভজনে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও লিখেছেন যে, রাধারাণীর সখী-মঞ্জরীদের ভাব নিয়ে কৃষ্ণসেবা করতে হলে ভজনোন্নতিকামীদের পক্ষে রাধাকুণ্ডই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ভক্তদের মধ্যে যারা 'সিদ্ধদেহ' লাভ করে অপ্রাকৃত ধাম, গোলোক-বৃন্দাবনে যেতে চান, তাঁদের রাধাকুণ্ডতটে ভজন করা উচিত; এবং রাধারাণীর ঘনিষ্ঠ কোন মঞ্জরীর আশ্রয়ে ও তাঁর নির্দেশে কৃষ্ণসেবা করা উচিত। গৌড়ীয় কৃষ্ণভক্তদের কৃষ্ণভজনের এই হচ্ছে সর্বোত্তম পথ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন যে নারদ মুনি, সনকাদি মহান্ ভক্তরা পর্যন্ত রাধাকুণ্ডে স্নান করার সুযোগ পান না। সেক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তদের কথাই ওঠে না। সৌভাগ্যক্রমে কেউ যদি রাধাকুণ্ডে গিয়ে একবার স্নান করতে পারে, তা হলে সে গোপীদের মতো কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। রাধাকুণ্ডতটে বাস করে ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট থাকবার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। সব রকম জড়-ভাবনা ত্যাগ করে রাধারাণী বা তাঁর মঞ্জরীর অধীনে রাধাকুণ্ডতটে ভজন করা উচিত। এইভাবে সারা জীবন ভগবদ্ভজন করলে দেহত্যাগের পর ভগবদ্ধামে গিয়েও এইভাবে রাধারাণীর অধীনে ভগবদ্ভজন করা যাবে। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতিদিন রাধাকুণ্ডে স্নান ও সেখানে ভগবদ্ভজনের মধ্যেই ভক্তিযোগের চরম সাফল্য নিহিত আছে। এমন কি নারদ মুনি ও অন্যান্য মহান্ ভক্তদের পক্ষেও এই সুযোগ লাভ করা খুবই কঠিন। রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য অপরিসীম, সুতরাং রাধাকুণ্ডতটে ভগবদ্ভজন করে গোপীগণের অধীনে রাধারাণীর সেবা লাভের সুযোগ পাওয়া যায়।